বাঙলার রাজনীতির

সেকাল-একাল

ওমর খালেদ রুমি

বাঙলার রাজনীতি বরাবরই বৈচিত্র্যময়। ভারতীয় উপমহাদেশের এই বিশেষ ভূখণ্ডটি খুব কম সময়ই পরাধীন ছিল। দোর্দণ্ড প্রতাপ মোগলরাও বাঙলাকে খুব বেশি সময় অধীনস্থ করে রাখতে পারেনি। মূলত শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের সময় যে বাঙলা 'সুবা বাঙলা' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল তার রেশ শত শত বছর ধরে বিদ্যমান ছিল। ইংরেজদের আগমনের পর সেই বাঙলা প্রথমবারের মতো মাথা নত করেছিল। আত্মসমর্পণ করেছিল টানা ১৯০ বছরের জন্য। ১৯৪৭-এ এসেও সেই ধকল পুরোপুরি কাটেনি। পাকিস্তানীরা ২৩ বছর অপশাসন চালালো। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এলো আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। তারপরও দেখতে দেখতে ৪৫টি বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ে কেউ কেউ রাজনীতি করেছে, কেউ করেছে রাজনীতির নামে ব্যবসা, কেউ করেছে ধর্ম-ব্যবসা। এই বৈচিত্র্যময়তার মধ্যেও আমরা খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করেছি বাঙলার রাজনীতির সত্যিকারের স্বরূপ। এই বইটি সত্যিকারের ইতিহাস সন্ধানীদের ভাবনার খোরাক যোগাবে।

www.pathagar.com

বাঙলার রাজনীতির
সেকাল-একাল

www.pathagar.com

বাঙলার রাজনীতির সেকাল-একাল

ওমর খালেদ রুমি

www.pathagar.com

বাঙলার রাজনীতির সেকাল-একাল
ওমর খালেদ রুমি

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০১৬

রোদেলা ৪০১

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০।
সেল: ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
মোবারক হোসেন লিটন

অনলাইন পরিবেশক
http://rokomari.com/rodela

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪, (বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭, ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ২২০.০০ টাকা মাত্র

Banglar Rajnitir Sekal-Akal By Omar Khaled Rumi
First Published *April 2016*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, Paridas Road, (Banglabazar) Dhaka-1100.
E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price : Tk. 220.00 Only US $ 05.00
ISBN : 978-984-91701-6-7 Code : 401

www.pathagar.com

উ ৎ স র্গ

জনাব এ কে এম আউয়াল
মাননীয় সংসদ সদস্য
পিরোজপুর-১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

পূর্বকথা ৯
ভূমিকা ১১
ইতিহাসের অন্ধকার বাঁকে ১৫
'৪৭ পূর্ববর্তী বাংলার রাজনীতি : আলো আঁধারির লুকোচুরি ১৭
যেখানে স্বাধীনতার বীজ নিহিত ২১
যেভাবে শুরু হয়েছিল সেই চেতনার ২৪
১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ২৬
যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা ২৭
১৯৫৬ সালের সংবিধান ৩০
Ayub Khan's Basic Democracy ৩৫
Tashkent Declaration ৪০
শেখ মুজিবের ৬ দফা ৪১
ছাত্রদের ১১ দফা ৪৪
১৯৬৯ : ফিরে দেখা ৫০
Legal Framework Order 1970 ৫২
১লা মার্চ-২৫শে মার্চ : উত্তাল দিনগুলো ৫৫
মূলত যুদ্ধ ছিলো অনিবার্য ৫৭
রক্ত গঙ্গায় ভেসে ভেসে ৬০
মুজিবনগর থেকে ঢাকা : এক সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা ৭৯
স্বাধীনতার ঘোষণা ৭৯
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ৮০
তাজউদ্দিন আহমদের ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১-এর ভাষণ ৮৩
বাংলাদেশ নামে দেশ ৯৬
They Were Defeated By Themselves ৯৭
শেখ মুজিব অধ্যায় ১০০
আবারও রক্তাক্ত হলাম ১০৪
শেখ মুজিব হত্যা পরবর্তী অধ্যায় ১০৫

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমানের শাসনামল (১৯৭৫-৮১) ১০৬
এরশাদ আমল (১৯৮২-৯০) ১০৭
গণতন্ত্রে উত্তরণ ১০৮
খালেদা জিয়ার শাসনামল (১৯৯১-১৯৯৬) ১০৮
নেতৃত্বের নতুন সংজ্ঞা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১১০
কেন এই মুখোমুখি অবস্থান ১১৪
৪৪ বছরের জ্বালা পোড়া ১১৬
উপসংহার ১১৯
The Pakistani Instrument of Surrender ১২১
গ্রন্থপঞ্জি ১২৩

www.pathagar.com

পূর্বকথা

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন যখন পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয় ঠিক তখনই শুধু বাংলার ভাগ্যাকাশেই দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসেনি, পুরো উপমহাদেশের জন্যেই পরবর্তী ১৯০ বছরের জন্যে রচিত হয়েছিল দাসত্বের শৃঙ্খল। সেদিন কি কোনো ধ্যানী দরবেশ তার দিব্য চোখে দেখতে পেয়েছিল, কী অমানবিক এবং অমানুষিক এক কাল অপেক্ষা করছে তার মাতৃভূমির জন্যে। সেদিন কতিপয় হীনমন্য মানুষের ঘৃণ্য আচরণের কারণে যে পৈশাচিক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল তার কুহেলিকা আমার মনে হয় আজও এই মাটি থেকে মুছে যায়নি। আসলে কাপড়ে কোনো কিছুর দাগ লাগলে তা যেমন শত ধুলেও মুছে যায় না পরাধীনতা জিনিসটা অনেকটা ঠিক এমনই। ভূগোলের সীমারেখা আর আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দিলেও এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমাদের মন থেকে ঔপনিবেশিক দাসত্বের ভূত এখনো নামেনি। কোনোদিন নামবে কি-না সন্দেহ আছে। কারণ আর কিছু নয়। আমাদের এই মানব শরীরের ভেতরে লুকায়িত জিনসমূহের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখার রহস্যময় ক্ষমতা। অনেক অপকীর্তিমূলক বৈশিষ্ট্যকে আমরা যে কী গভীর যত্নে আর আবেগে ধরে রেখেছি তার প্রমাণ ইতিহাসের পাতা খুললে বারবার দেখা যায়। যদিও ইতিহাস কোনো একটা বিশেষ জায়গা থেকে শুরু হয়নি এবং যদিও তা মূলত একটা চলমান প্রক্রিয়া তবুও মীর জাফরের বেইমানির কাল থেকেও যদি ধরি, আমাদের ইতিহাস যে খুব একটা সুখপ্রদ তা কিন্তু বলা যাবে না। এখানে মধুরতম সুখের স্মৃতি যতটা না খুঁজে পাওয়া যাবে তার চেয়ে হাজারো গুণ বেশি দেখা যাবে ঘৃণা, হিংসা, হানাহানি, কূটিলতা এবং আরও কত রকমের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের গল্প। আওরঙ্গজেবের হিংস্রতায় দারা, সুজা, মুরাদের করুণ পরিণতি যেমন ছিল ইতিহাসের অমোঘ বিধান তেমনি উপমহাদেশের রাজনীতিতেও পলাশী পরবর্তী সময়েও এমনি অজস্র ধ্বংস আর সৃষ্টির লোমহর্ষক কাহিনীর ছড়াছড়ি দেখা

www.pathagar.com

যায়। সময় বা পরিস্থিতি ভেদে হয়তো রাজনীতির রং, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ পাল্টেছে কিন্তু রাজনীতির আসল চেহারা মূলত একই। ইংরেজ আমলে যে সাম্রাজ্যবাদ আমাদের গ্রাস করেছিল তেমনি পাকিস্তান আমলে এসে আবার সেই একই ঔপনিবেশিকতাবাদ। আমাদের মুক্তি কোথায়? সব পেরিয়ে এসে অবশেষে এক নদী রক্ত গঙ্গায় ভেসে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ণ বিজয়ের মাধ্যমে যদিও স্বাধীনতার সূর্য দেখলাম কিন্তু তাতেই বা কী এমন লাভ হলো। আমাদের অন্ধ স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা, হিংসা, হানাহানি আর অদূরদর্শিতা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের স্বাধীনতাকে অর্থহীন করে তুললো। জাতির জনক বেঁচে থাকতেই তার চোখের সামনেই আমরা তার আদর্শকে ভূলুণ্ঠিত করলাম। অবশেষে তিনি তাঁর জীবন দিয়ে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন। এই কি তবে বিধির বিধান। সারাজীবন তিনি যে জাতির জন্যে বিসর্জন দিলেন সেই জাতির হাত তাঁর রক্তে রঞ্জিত হওয়া কি এতোটাই জরুরি হয়ে পড়েছিল? আসলে সত্যিকারের ত্যাগের মানসিকতা তৈরি হওয়ার আগেই অনেক দ্রুত পেয়ে যাওয়া স্বাধীনতার মূল্য আমরা বুঝে নিতে পারিনি। যে সূর্য তিনি আমাদের এনে দিয়েছিলেন তার আলোকরশ্মি সইতে না পেরে আমরা পাপী আর অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা কোন মহান অর্জনের সার্থক উত্তরাধীকারী হতে পারলাম না। কিন্তু এ নিয়েও আমাদের কোনো আফসোস নেই। আফসোস হবে কেমন করে। ঐ যে বলেছিলাম, জীনের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্য কেবল সব কলুষকেই ধারণ করে। সুন্দর কোনো কিছু সে যেন ধরে রাখতে চায় না। নাকি পারে না তাও ঠিক বোঝা যায় না। ফুলের ঘ্রাণ কত দ্রুত মিলিয়ে যায়। কিন্তু নর্দমার পচা-গলা গন্ধ যেন বারোমাসী। আমরা আজও সেই মানসিকতার অন্ধ গলিতে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছি। আমাদের সত্যিকারের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আর সামাজিক মুক্তির পাশাপাশি মানসিক মুক্তিরও বড় প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা আর হলো কই। অসুন্দরকে ধারণ করতে করতে আমরা আসলে নষ্টেরও অযোগ্য হয়ে পড়েছি। নইলে একটা সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে কেমন করে মানুষ এতো দ্রুত স্বাধীনতার আদর্শকে ভূলুণ্ঠিত করেছিল। জলাঞ্জলি দিয়েছিল অজস্র ত্যাগী মানুষের দীর্ঘ ২৪ বছরের ত্যাগ আর তিতিক্ষায় গড়া অর্জনের সৌধ। আমরা মানুষ। তাই আমাদের দ্বারা সবই সম্ভব। আর কোন প্রাণী এতোটা বিচিত্র নয়। এই বইয়ে আমি এমনি অজস্র প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা করেছি মাত্র।

www.pathagar.com

ভূমিকা

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। একথা হয়তো কোনো বড় সমাজবিজ্ঞানীই বলেছিলেন। কিন্তু ১৭৫৭ সালের পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই ২১৪ বছর এই বাংলার জমিনে যতো শিশু জন্মেছে তারা যেমন জন্মেছে পরাধীন হয়ে তেমনি বড়ও হয়েছে পরাধীনতার মধ্যে দিয়ে। কয়েক প্রজন্ম ধরে এই বাংলার মানুষ পরাধীনতার মধ্যে দিয়েই তাদের জীবন পার করে চলে গেছে পরপারে। এসব নিষ্ঠুর ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু এই সত্যই শেষ কথা নয়। এ নিয়ে ভাববার অবকাশ আছে। কীভাবে পরাধীন হলাম, কেন এতো দীর্ঘ একটা সময় ধরে দাসত্বের যাতাকলে নিষ্পেষিত হতে হলো। কেন প্রাণ দিতে হয়েছিল তিতুমীর, হাজী শরীয়ত উল্লাহ, দুদু মিয়া, মাস্টারদা সূর্যসেন কিংবা আরও অনেক নাম না জানা বিদ্রোহীদের। কী শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা আমাদেরকে। স্বাধীনতা তো কোনো গাছের ফল ছিল না। আর তা একদিনে আসেওনি। মূল্যবান কিছু পেতে হলে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পেছনে যে রক্তঝরা ইতিহাস তাতে মধুর চেয়ে অম্লের পরিমাণ যে কতোটা বেশি তা সবারই কম-বেশি জানা। ২৫শে মার্চের কালো রাতে পাকবাহিনীর হাতে বন্দি অতঃপর হদিসবিহীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন ১০ই জানুয়ারি আমাদের মাঝে ফিরে আসেন তখন আমাদের সাথে সাথে পুরো পৃথিবীটাই আনন্দে উদ্বেল হয়েছিল। কিন্তু সেই মানুষটি যে ছিল, শুধু তার মনই জানে কি অনুরণন, কি তোলপাড় হয়েছিল তার বুকের ভেতর, সমস্ত সত্তায়, পুরো অস্তিত্ব জুড়ে। একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, মুজিব নিজেও ছিলেন একজন সন্তান, স্বামী, পিতা, কারো ভাই, কারো বা বন্ধু। সব কিছুকে ছাপিয়ে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মানুষ। তাই তার অনুভূতি আর অনুভবগুলোও ছিলো অন্যের থেকে আলাদা। যে কোন পরিস্থিতিকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আবেগে অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি হতে পেরেছেন একটি জাতির জনক। এরকম একটি মানুষের অনুভূতি সত্যিকার

www.pathagar.com

অর্থেই কেমন হতে পারে পুরোপুরি বোঝা না গেলেও অন্তত এতোটুকু আঁচ করা যায়, তাঁর ভেতরে ভেতরে অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছিল। তিনি এবং তাঁর পরিবার তা নীরবে সহ্য করতে পেরেছিলেন বলেই দীর্ঘ ২৪ বছরের গভীর সাধনায় তারা বাঙালি জাতির জন্যে স্বাধীনতার অমর কাব্য লিখতে পেরেছিলেন। মুজিব তাই হতে পেরেছিলেন বাঙালির আত্মার আত্মীয়, প্রাণের মানুষ। তাঁর হাতের বীণায়ই তাই বেজেছিল স্বাধীনতার অমর বাজনা। কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল স্বাধীনতার যাদুকরী সুর।

'স্বাধীনতা একদিনে আসেনি' মূলত কোনো গবেষণাধর্মী বই নয়। তবে ১৯৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননে আমরা যে স্বাধীনতাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আবার তাকে ফিরে পেতে আমাদের যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল তার নানা অলি-গলির আঁকা-বাঁকা পথে-ঘাটে ছড়ানো-ছিটানো কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা আর তার মূল অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা মাত্র। ইতিহাস নিজেই তার আকৃতিতে বিরাট, ব্যাপক আর বিস্ময়কর। তাকে আমার লিখে বড় করার মতো কোনো কারণ দেখছি না। ঐতিহাসিকদের জন্যে নয়, বরং ইতিহাস পিপাসুদের জন্যে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কলেবরে স্বাধীনতার এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমার কিছু কিছু জায়গায় আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। এই বইটি পড়ার পরে যদি কারো মানসপটে সামান্য হলেও স্বাধীনতার জন্যে একটি মানবিক চিত্র ভেসে ওঠে তাহলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। অন্যথায় ধরে নেব, সেই শাশ্বত সত্য যে, আমাদের জিনগত বৈশিষ্ট্য আসলেই বিচিত্র। আমরা যতোটা না সুগন্ধকে ধরে রাখতে পারি, নর্দমার গন্ধ তার চেয়ে বেশি স্থায়ী হয়। মানব চরিত্রের এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত। তার মন কেন জানি নষ্ট আর নোংরামিতেই মজে থাকে।

www.pathagar.com

বাঙলার রাজনীতির
সেকাল-একাল

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইতিহাসের অন্ধকার বাঁকে

এই বাংলার ইতিহাস অনেক পুরাতন দীর্ঘ গৌরব আর গর্বের। সহস্র বছর পূর্বে গোপাল নির্বাচনের মাধ্যমে রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় এদেশের ইতিহাস কত বিস্তৃত আর ব্যাপক। তবে আমি সেই পুরনো দীর্ঘ ইতিহাসের সবটুকু আলোচনা করতে পারবো না। আমি শুধু সম্মিলিত ভারতবর্ষে কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত ইতিহাসের অন্ধকার বাঁকগুলো আলোচনা করব। সবাই না জানুক যারা এসব নিয়ে ভাবে তাদের অন্তত কাজে আসবে বলে মনে করি।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রবার্ট ক্লাইভের সাথে হাত মিলিয়ে মীর জাফর বাংলার মসনদ দখলের যে ষড়যন্ত্র করেছিল কিছু কাল যেতে না যেতেই তার স্বপ্নভঙ্গ হয়। বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরকে ইংরেজরা পরিত্যাগ করে। কিন্তু একথা আমরা অনেকেই জানিনা যে আলীবর্দী খাঁ নিজেই জগৎশেঠ এর সহযোগিতায় তৎকালীন নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেই ক্ষমতার মসনদে বসেছিলেন। পরবর্তীতে তার বংশধরদেরও সেই একই পরিণতি বহন করতে হয়েছিল।

১৮৮৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ব্রিটিশ ব্যক্তিত্ব এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম-এর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের জন্ম হয়। কংগ্রেসের জন্ম ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিরল এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯০৬ সালে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেসই ছিল ভারতীয়দের জন্য একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন। কিন্তু মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার পরপরই উপমহাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে যেতে থাকে। এতদিনের পশ্চাদপদ মুসলমানরা সামনে এগিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু হিন্দু আধিপত্যবাদীদের এটা ভালো লাগেনি। তাই তারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন করেন যা 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে পরিচিত। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। কিন্তু ইংরেজরা ঠিকই

www.pathagar.com

রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরিয়ে নেন। ফলে কলকাতাকেন্দ্রিক ক্ষমতার পরিবর্তন হয় এবং দিল্লি হয়ে ওঠে মূল কেন্দ্র।

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। পাকিস্তানের সৃষ্টি যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তখন ভারতীয় হিন্দু রাজনীতিকরা ইংরেজদের সাথে যোগসাজশ করে এমন একটা পাকিস্তান উপহার দেয় যা না হলেই নয়। কৃশকায় হতে হতে পাকিস্তানের আকৃতি এতোটাই ছোট হয়েছিল যে বিশাল ভারতের পাশে তার অস্তিত্বই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে ওঠে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলার ইতিহাসে এক অমর অধ্যায়। সবাই জানে এবং মানে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত মূলত এখান থেকেই। সেদিন পাকিস্তানীরা এই ঐতিহাসিক ভুল না করলে বাংলার স্বাধীনতা হয়তো আরও প্রলম্বিত হতে পারত। ভাষার ষড়যন্ত্র মূলত আমাদের জন্যে শাপে-বর হয়েছিল।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফল না মেনে নিয়ে পাকিস্তানীরা ইতিহাসে আরও একটি ভুল করেছিল। সেদিনের যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দিয়ে পাকিস্তানীরা যে ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিল তার ফলাফল যে ভালো হয়নি তা সবারই জানা।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে শেখ মুজিব ও অন্যান্যের নিপীড়নের যে চিন্তা করা হয়েছিল তাতে হিতে বিপরীত হয়েছিল। আইয়ুব খানকে ক্ষমতা থেকে নেমে যেতে হয়েছিল।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর শেখ মুজিবকে উভয় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হলে বাংলার স্বাধীনতা আজও অর্জিত হতো কি-না সন্দেহ ছিল। পাকিস্তান হয়তো একটি ফেডারেশন হিসেবেই থেকে যেত। ক্ষমতা হস্তান্তর করতে না চাওয়ার সেই ঐতিহাসিক ভুল থেকেই আজকের বাংলাদেশের জন্ম।

www.pathagar.com

'৪৭ পূর্ববর্তী বাংলার রাজনীতি : আলো আঁধারির লুকোচুরি

অনেক রক্তক্ষয় ও সংগ্রামের পর পাকিস্তান নতুন রাষ্ট্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করে ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ সালে। ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানের ১৬০০ কিলোমিটার (৯৯০ মাইল) ভারতের সীমানার ভেতরে ছিলো। এবং সেখানে কঠোরভাবে হিন্দু আইন জারি ছিল। পরে ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর অনেক হিন্দু পরিবার ভারতে চলে যায়। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পরে মুসলিম ব্যাংকিং বোম্বে (মুম্বাই) থেকে করাচিতে স্থানান্তর করেন যা পাকিস্তানের প্রথম রাজধানী। অধিকাংশ বিনিয়োগ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাংকে জমা হত। বিশ্বের সব থেকে বড় পাট প্রক্রিয়াজাত কোম্পানি ছিল নারায়ণগঞ্জে। এবং শিল্পকারখানাগুলো ছিলো ঢাকা কেন্দ্রিক। কারণ ব্যাংকিং এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনাগুলো ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হলো। সৃষ্টি হলো দুটি রাষ্ট্রের। একটি পাকিস্তান। অন্যটি ভারত। ভারত একটি মাত্র ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত হলেও পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি একটি দুই মাথাওয়ালা প্রাণীর মতো বিকৃত আকৃতি নিয়ে জন্ম নিলো। যার এক মাথার থেকে অন্য মাথার দূরত্ব ৯০০ মাইল। অদ্ভুত ব্যাপার। সেদিন যারা ছিল তারা না চাইলেও এই বাস্তবতা মেনে নিয়েছিল।

অজস্র বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে এই বিষয়টির। গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে হাজারো তথ্য-উপাত্ত, বাস্তবতা, ইতিহাস, কল্প-কাহিনী। সবচেয়ে বড় সত্য পাকিস্তান আন্দোলন শুধু একটি রাষ্ট্রের জন্মের আন্দোলন ছিলো না। এটা ছিলো একটি জনগোষ্ঠীর (হিন্দু)-র বিপরীতে আরেকটি জনগোষ্ঠীর টিকে থাকার নির্মম করুণ ইতিহাস। এক দুই যুগের ব্যাপার ছিল না। এমনকি এক দুই শতকেরও ব্যাপার ছিলো না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই হিন্দু-মুসলিম বস্তবতা সবচেয়ে নিদারুণ বিষয় হয়ে বিরাজিত ছিলো। *এটা লেখা হয়েছিল মূলত রক্ত দিয়ে।* আজও আমি চোখ বুজলে কল্পনায় সে সময়ে

www.pathagar.com

চলে যাই। তাতে পুরো উপমহাদেশ জুড়ে মরা মানুষের খুলি বিছানো দেখতে পাই। এসব নির্মম সত্য। এটা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। *তাই তো সেদিনের বাস্তবতায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভৌগোলিক আকৃতির চাইতেও এর মূলমন্ত্রই ছিলো মুখ্য।* আর সেই মূলমন্ত্রই ছিলো মুসলমানের জন্যে একটি পৃথক রাষ্ট্র। তা সে যত মাথারই হোক না কেন।

ইতিহাসের বাস্তবতা বড়ই নিষ্ঠুর। আজ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় বসে আমার জন্য এই বিশ্লেষণ লেখা যতো সহজ, সেদিনের বাস্তবতায় ফুটতে থাকা মাথার খুলির আওয়াজের ভেতর একটি জাতি রাষ্ট্র চিন্তা করাই কঠিন। সমগ্র ঐতিহাসিক তাদের লেখায় ঐ বাস্তবতা স্বীকার করেছেন। সেদিনের বাস্তবতায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম না হলে হয়তো উপমহাদেশে দুইটি ঘটনা ঘটতো। তার প্রথমটি সম্মিলিত ভারতে মুসলমানরা অন্যান্যের সাথে মাথা তুলে দাঁড়াতো। নয়তো ধীরে ধীরে কালের গর্ভে অন্যদের সাথে আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিলে যেত। কিন্তু ইতিহাস এতোটাও সহজ নয়। অশান্তি হতো বিস্তর। কারণ নির্ভুল সত্য হলো মুসলমানদের জাতিগত ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য পুরোপুরিই পৃথক। এটা অন্য কারো সাথে যায় না। গো হত্যার বিরোধী বহু দেবতায় বিশ্বাসী হিন্দুদের সাথে তাওহীদপন্থী মুসলমানদের গায়ে গায়ে মিশে যাওয়া কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। যতই বুলি আওড়ানো হোক না কেন ধর্মের নামে শিক্ষিত ব্যারিস্টারও হয়ে যায় কসাই। ডাক্তারও হয়ে যায় মানুষহন্তারক। '৪৭-এ ঠিক তাই ঘটেছিল। আমরা জানি বা না-জানি ইতিহাসের এটিই বাস্তবতা। আমরা মূলত '৪৭ এর পূর্ববর্তী সময়ের বাংলার রাজনীতির কথা আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। অন্তত আমার জন্য। কারণ আর কিছু না। আমি তখন ছিলাম না। আমাকে তাই সুদূর অতীতের ঘটনার বিশ্লেষণের জন্যে ইতিহাসের তথ্য-উপাত্তের উপর নির্ভর করতে হয়। এতে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা অনেক।

খুব বেশি আলোচনার দরকার হয় না। বোঝার জন্য অল্প কিছুই যথেষ্ট। সবচেয়ে বড় কথা একটু খেয়াল করলেই সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যায়। আর তাই তো আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই সেদিন শের এ বাংলা একে ফজলুল হকের সামনেই তার কৃষকপ্রজা পার্টি দেখতে দেখতে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। উঠে এলো মুসলিম লীগ। সেদিনের নির্মম বাস্তবতায় এটিই সত্য ছিল। রাজনীতি বাংলার সীমানা পেরিয়ে জাতি আর ধর্মের চাদরে জড়িয়ে গিয়েছিল। এ সব অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলাকে ভালোবাসে এমন মানুষ যে সেদিন ছিলো না তা কিন্তু নয়। অনেকেই ছিল। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। লাভ হবেই বা কেমন করে। স্বয়ং

www.pathagar.com

জিন্নাই যেখানে বলেছিলেন বাংলা আলাদা হলেও তার আপত্তি নেই। কিন্তু সেই কথার পরও কেউ আলাদা হতে সাহস পায়নি । '৪৬-এর গণভোট পাকিস্তানের সাথে থাকারই রায় দেয়। এসব অস্বীকার করার উপায় নেই। মূলত ইংরেজ আসার পর থেকেই উপমহাদেশের রাজনীতি নতুন মাত্রা পেয়েছিল। হিন্দু তোষণ পদ্ধতি মুসলমানদের কোণঠাসা করেছিল। পরবর্তীতে সেই মুসলমানদেরকেই হিন্দুদের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে ছুড়ে দিল ইংরেজরা। দারুণ রাজনৈতিক কৌশল। তাতে লাভ তাদেরই হলো। ১৯০ বছর তারা টিকে থাকল।

উপমহাদেশের রাজনীতিতে দ্বিতীয় বড় বাস্তবতা শুরু হয় ১৯০৬ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ হলো। মুসলমানদের ভাগ্যের শিঁকে ছিড়লো। কিন্তু তার সে সৌভাগ্য খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। নানা ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের নামে সেদিন এটা বানচাল করা হয়েছিল। এতে তৎকালীন প্রতিক্রিয়াশীলদের মদদ ছিল। মুসলমানরা মাথা তুলে দাঁড়াক এটা যারা চায়নি তারাই সেদিন বাংলা বিভাগ চাননি। তাই ধোঁয়া তুলেদিলেন। কিন্তু '৪৭-এ এসে সেই বাস্তবতা আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। সেদিন কথিত "দুই বাংলা অবিভক্ত থাকার মতবাদে বিশ্বাসীরাই" বাংলাকে আলাদা করার পক্ষে ভোট দিয়েছিল। আমরা কেমন করে এসব সত্যকে ভুলে থাকব। আসলে এই সবের মধ্যে রয়েছে নিষ্ঠুর সব সত্য। সবারই তো আর মাথা মোটা না। কিছু কিছু চিকন মাথার জনগণওতো আছে। তারাই সহজভাবে চিন্তা করতে পারেনি। এরাই প্রতিক্রিয়াশীল।

১৯০৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময় এতোটা ঘটনাবাহুল যে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য একটি প্রবন্ধ তো দূরে থাক একটা আস্ত বইও যথেষ্ট নয়। আসল কথা হলো আমি যা বলতে চাই তা অত্যন্ত পরিষ্কার। সেদিন বাংলার রাজনীতি তার নিজস্ব খোলস থেকে বেরিয়ে একটা আলাদা স্থানে ছড়িয়ে গিয়েছিলো। তাছাড়া এর উপায়ও ছিলো না। কুয়ো যদি পানিতে ভরে যায় তবে তা বাইরে তো বেরিয়ে আসবেই।

অনেকেই যুক্তি তর্ক দেখায় বাংলার রাজনীতির বহুমাত্রিক ব্যাসার্ধই সেদিনের ঘটনা প্রবাহের জন্যে দায়ী। কথা মিছে নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে কামান না দাগানোর পেছনে হাজারো কারণ থাকতে পারে। কিন্তু বারুদ না থাকার চাইতে আর কোনো বড় কারণ বোধহয় অর্থহীন। সেদিন আমাদের বারুদ আমাদের হাতে ছিলো না। একটা বিশেষ স্রোতেই ভেসে গিয়েছিলাম। সেই প্লাবনকে অস্বীকার করার কোনো উপায়ই সেদিন তো দূরে থাক আজও নেই।

www.pathagar.com

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম এবং ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম। মুসলিম লীগের জন্মের পর এই প্লাবন আরও প্রাতিষ্ঠানিক ও বেগবান হয়েছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষণে অনেক কিছু বেরিয়ে আসে এই কথা মিথ্যা নয়। আর এই সব যে অর্থহীন তাও নয়। কিন্তু আসল সত্যি লুকিয়ে থাকে মনের ভেতর। মানুষের অজান্তেই তার মনখোলাসা করে অনেক কিছু আসে যা সে আসলে জানেও না। ১৯৪৭ সালেই বাংলার অস্তিত্ব সবার মনের ভেতর ঘুরপাক খেলেও সেটাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার মতো অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো জীবন্ত কিংবদন্তি ছিলো না। ১৯৭১ সালে মুজিবই পেরেছিলেন। ১৯৪৭-এ তখনকার কেউ তা পারেননি। কারণ একটাই । সময় ও স্রোত কোনোটাই তাদের পক্ষে ছিলো না। কেউ কেউ এটাকে ইতিহাসের কাছে আত্মসমর্পণ বলতে পারেন। আমিও অস্বীকার করবো না। ঘটনা প্রবাহ মূলত নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিলো।

www.pathagar.com

যেখানে স্বাধীনতার বীজ নিহিত

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননে স্বাধীনতা হারিয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হয় সেখানেই আমাদের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল। হারানো থেকেই তাই খোঁজার শুরু। আসলে যাতে উৎপত্তি তাতে যেমন ক্ষয়, তেমনি যাতে ক্ষয় তাতেই উৎপত্তি। পলাশীর যুদ্ধে সেদিনের সেই পরাজয় অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। অনেক দেশপ্রেমিকের আত্মাই সেদিন নীরবে নিভৃতে কেঁদেছিলো। আর তখন থেকেই শুরু হয়েছিল স্বাধীনতাকে ফিরে পাবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। ইংরেজদের কাছে স্বাধীনতা হারালেও সবাই যে মনে-প্রাণে ইংরেজ শাসন মেনে নিতে পারেনি তার জলন্ত প্রমাণ ছিলো ইংরেজদের সাথে মীর কাসীমের যুদ্ধ। ইতিহাসে যা বক্সারের যুদ্ধ (২২শে অক্টোবর ১৭৬৪) নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে মীর কাসীম পরাজিত হন। ১৭৫৭ সালে স্বাধীনতা হারানোর মাত্র সাত বছরের মাথায়ই জ্বলন্ত প্রতিবাদ। ইতিহাস আসলে এমনি বিচিত্র। এখানে ভুল করে তা নিয়ে বেশিক্ষণ বসে থাকার সময় নেই কারোরই। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতেই হয়। জয়-পরাজয়ের কথা ভাববার সময় থাকে না। বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসীমের পরাজয় হলে মীর জাফর আবার বাংলার সিংহাসনে বসেন। তবে তিনি বরাবরই পুতুল নবাব ছিলেন। কিন্তু ১৭৬৫ সালে তার মৃত্যু হলে কোম্পানি বাংলা বিহার উড়িষ্যার (উড়িষার) দেওয়ানি লাভ করে। মুছে যায় বাংলার স্বাধীনতার শেষ চিহ্নটুকুও।

তার পরের ১৮০ বছর ইংরেজদের যৌথ শাসন-শোষণের ইতিহাস। এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে বাঙালিকে যে ত্যাগ তিতিক্ষা সহ্য করতে হয়েছিল তা উপমহাদেশের আর কোনো জাতি বা গোষ্ঠীকে সহ্য করতে হয়নি। কারণ আর কিছু নয়। স্বাধীনতা খোয়া গিয়েছিল এখান থেকেই। আর ইংরেজদের উত্থানও এখান থেকেই। কলকাতা তাই ছিলো তাদের রাজধানী। আর তা বহাল ছিল ১৯১২ সাল পর্যন্ত। প্রায় ১৫৫ বছর।

www.pathagar.com

এই লম্বা অবসরে বাঙলার জমিনে ঘটেনি এমন কোনো ঘটনাই নেই। বিশেষ করে ইংরেজি ১৭৭০ সাল অর্থাৎ বাংলা ১১৭৬ সালের মন্বন্তর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় অর্ধেকের বেশি লোক মারা গিয়েছিল এই নিদারুণ মন্বন্তরে। শিল্পীর তুলিতেও সেই করুণ চিত্র আঁকা সম্ভব নয়।

এমনই এক ক্রান্তিলগ্ন পেরিয়ে যার আত্মা এই ধরণীকে ধন্য করার জন্যে জন্ম নিয়েছিল তিনি রাজা রামমোহন রায়। ১৭৭৪ সালের ১০ই মে তার জন্ম হয়েছিল। মানব জাতির জন্যে তিনি অনেক আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন।

এরই মধ্যে ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করলে ব্রিটিশদের সাম্রাজ্য হারানোর ভীতিতে পেয়ে বসে। বাংলা শাসনের ব্যাপারে তারা তাই ক্রমশ দৃঢ়তা অবলম্বন করতে থাকে। তাদের সেই ইস্পাত নীতিই মূলত আমাদের ইতিহাসের মূল উপাদান। আমরা আজ যাকে ইতিহাস বলছি তা ছিলো সেদিনের আমাদের পূর্বপুরুষদের রক্তের হোলি খেলা। কি মুসলিম কি হিন্দু, কেউ আগে কেউ পরে, ইংরেজদের শাসন শোষণের যাতাকলে সবাইকে পিষ্ট হতে হয়েছিল।

১৭৭৮ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর হুগলিতে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হলে মুদ্রণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৭৮৪ সালের পিটের ভারত শাসন আইন ছিল ইংরেজ শাসনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের এক বিরাট দলিল। ১৭৮২ সালে ময়মনসিংহে ফকির বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। কিন্তু বিদ্রোহে ফকিররা পরাজিত হয়েছিল। ১৭৮৩ সালে ফকিরদের দলপতি মজনু শাহ মধুপুর অরণ্যে পশ্চাদপসারণ করেন। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে বাস্তিল দুর্গের পতন হয়। মানব ইতিহাসে এটি একটি বৈচিত্র্যময় ঘটনা। এই বিপ্লব বাংলার মানুষের মনের উপর ভীষণভাবে রেখাপাত করেছিল আর এ সব ঘটনার ভিতরেও স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা এই জমিনের উপর অভিশাপ হয়ে এসেছিল। এই ব্যবস্থায় যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল তা স্বাধীনতার ইচ্ছাকে আরও জাগরত করে ছিল। এই সময়ের মধ্যে আরও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিলো কলকাতায় ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা। তবে তা বাঙালিদের কল্যাণের জন্য নয়। ইংরেজদের কার্যসিদ্ধির জন্যে।

ইতোমধ্যে ১৮২৯ সালে রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রহিত করা হয়। অবশ্য ১৮৩১ সালের ১৪ নভেম্বর তিতুমীরের মৃত্যু স্বাধীনতার আন্দোলনের এক মহতি উদ্যোগের আগুনে জল ঢেলে দেয়। অবশ্য জেনে রাখা দরকার ঐ একই বছরই অর্থাৎ ১৮৩১ সালের ৬ই মে সৈয়দ আহম্মদ শহীদ শিখদের হাতে নিহত হন। ১৮৪০ সালের ১৮

www.pathagar.com

জানুয়ারি ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়ত উল্লাহর মৃত্যু হলে ফরায়েজী আন্দোলনের ভার তার পুত্র দুদু মিয়ার উপর ন্যস্ত হয়। তিনি স্বাধীনতার জন্যে এই সংগ্রামকে ভিন্ন মাত্রা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৮৪৩ সালে দাসপ্রথা রহিত হলে সামাজিক ক্ষেত্রে এক বিশাল ও ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই সময় আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৮৪৮ সালে লন্ডনে কমিউনিস্ট মেনোফেস্টো প্রকাশ হয়েছিল। ১৮৫৭ সালে এসে উপমহাদেশে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। যা ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ নামে পরিচিত। ঐ বছরের ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরে ইতিহাস খ্যাত মঙ্গল পাণ্ডের ৩৪ দেশীয় পদাতিক বাহিনী বিদ্রোহ করে। পরবর্তী সময় ১৮৫৭ সালের ১৮ই নভেম্বর চট্টগ্রামে ও ১৮৫৭ সালের ২২ই নভেম্বর ঢাকায় সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। অবশ্যই এ ঘটনার পরিপেক্ষিতে ১৮৫৮ সালে ব্রিটেনের রানীর প্রত্যক্ষ শাসন কায়েম হয়।

১৮৭৬ সালে এই পলিটিক্যাল ইউনিয়নটিকে 'ইন্ডিয়ান এম্পায়ার' নামে আখ্যায়িত করে তৎকালীন রানী ভিক্টোরিয়াকে এর প্রশাসনিক প্রধান করে ব্রিটিনের রানীর প্রত্যক্ষ শাসন কায়েম করা হয়। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে সর্ব প্রথম ভারতীয় জাতীয়তাবোধের চেতনার উন্মেষ হয় বলে ধারণা করা হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে ১৯০৬ সালে গড়ে ওঠে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ। ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার বা কাউন্সিল এ্যাক্ট উপমহাদেশের শাসন ব্যবস্থায় দারুণ প্রভাব ফেলে। এই সংস্কারের ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক ভোটের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তী সময় ১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের ফলশ্রুতিতে প্রণীত দি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট উপমহাদেশের শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের অধিকতর অংশগ্রহণের পথ সুগম করে। ১৯৩০ সালে উপস্থাপিত সাইমন কমিশন রিপোর্ট ও ১৯৩১, ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে অনুষ্ঠিত তিন তিনটি গোল টেবিল বৈঠকের ফলশ্রুতিতে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়। পরবর্তীতে এর উপর ভিত্তি করেই ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে 'ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া' এবং 'ডমিনিয়ন অব পাকিস্তান' গড়ে উঠে। এই 'ডমিনিয়ন অব পাকিস্তান' ভেঙ্গে পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।

www.pathagar.com

যেভাবে শুরু হয়েছিল সেই চেতনার

> The Bangalis were a community prior to their demand for self-determination. No over-arching ideology such as Islamic doctrine, was necessary to bind them to one another.
>
> —Lawrence Ziring

মূলত ১৯৪৪ সালের দিকেই কলকাতায় বসবাসরত বাঙালি দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীরাই বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়ে সোচ্চার হতে শুরু করে। বিষয়টি যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তা আর একবার প্রমাণিত হয়। যখন সম্ভবত ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি দিকে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সর্বশেষ অধিবেশনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে বলে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাবটি এনেছিলেন চৌধুরী খালেকুজ্জামান। তখন অবশ্য এ নিয়ে বাঙালিদের মাথা ঘামানোর অতটা দরকার পড়েনি। কারণ পাকিস্তান তখনো তার বীজের মধ্যে নিহিত। আর তার পাশাপাশি শরৎচন্দ্র বসু ও হোসেন শহীদ সহরাওয়ার্দী যুক্ত বাংলা গঠনের চেষ্টাতে ছিলেন।

অবশ্য তাদের স্বাধীন যুক্ত বাংলা গঠনের আন্দোলন ভেস্তে গিয়েছিল, গান্ধী ও তার কংগ্রেসের অনমনীয় ভূমিকার জন্য। অবশ্য এর পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল কাহীরী ব্রাহ্মণ গোত্রীয় সফল রাজনীতিবিদ পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর। তিনিই গান্ধীকে তার মতো করে বুঝিয়ে ছিলেন। সাথে ছিল আরও বেশি অনমনীয় বলে পরিচিত বলব ভাই পেটেল এবং আরও কিছু তাদের সমগোত্রীয় আজীবনের অনমনীয় কট্টর নেতৃবৃন্দ। যা হোক শেষ পর্যন্ত যা হবার তাই হয়ে ছিল। ইতিহাস তার গর্ভ থেকে একটি দুই মাথাওয়ালা সন্তান পাকিস্তান প্রসব করেছিল।

সব মিলিয়ে প্রাথমিক পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে ভাববার মতো অবকাশ তখন বাঙালিদের ছিল বলে মনে হয় না, কিন্তু ঝামেলা বাঁধল তখনি যখন ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট সত্যি সত্যি পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হল। ভাষার এই বিষয়টিই দিন দিন কেন জানি কাবাবের হাড্ডির মতোই বাঙালির গলায়

www.pathagar.com

বাঁধতে শুরু করে। ১৯৪৭ সালের ৫ই আগস্ট গণতান্ত্রিক যুবলীগ নামে যে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ সংগঠন গড়ে উঠেছিল তারাও বাঙালিদের সরকারি ও নিত্যনৈমিত্তিক অন্যান্য কাজের ভাষা হিসেবে বাংলাকেই দাবি করে। পরবর্তীতে ঐ বছরেরই ১লা সেপ্টেম্বর ইসলামপন্থী চরিত্র নিয়ে গঠিত তমদ্দুন মজলিসও বাংলা ভাষার প্রশ্নে তাদের দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করে এবং ঐ মাসেরই ১৫ তারিখে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে।

সবকিছুর সাথে ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি গঠিত পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নামক একটি প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো দাবি উপস্থাপন করে। এসবই ঠিকঠাক মতোই চলছিল। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই আগুনে ঘি দেয়ার মতো হয়ে গেল যখন ১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ জীবনের প্রথম পূর্ববঙ্গ সফরে এসে ২১শে মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে জিন্না উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা ঘোষণা করেন। জিন্নার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এই ঘটনা প্রশমিত হলেও সেই আগুন আবার জ্বলে উঠল ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার সাথে সাথেই ১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারি মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। আন্দোলন সংগ্রামের এক পর্যায়ে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে গেলে পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও অজিউল্লাহ শহীদ হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি তাই মহান আত্মত্যাগের দিন। বাঙালির জাতীয় ও রাজনৈতিক দিনপঞ্জির ইতিহাসে সব চেয়ে উজ্জ্বলতম দিনগুলোর একটি। এই একুশের চেতনায় বাঙালির অন্তরে স্বাধীনতার চেতনার জন্ম দিয়েছিল। অবশ্যই এর পরও ভাষা নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিরা অনেক তালবাহানা করলেও অবশেষে ১৯৫৪ সালের ১৯ই এপ্রিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

যুক্তফ্রন্ট হচ্ছে পূর্ব বাংলার এমন একটি নির্বাচন যা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চের মধ্যে। এই নির্বাচন পূর্ব বাংলার ৪টি দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। দলগুলোর নাম পর্যায়ক্রমে আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নিজাম-ই-ইসলাম এবং গণতান্ত্রিক দল। মূলত এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই ২১ দফা দাবি করা হয়। এবং ২১ দফা দাবি গ্রহণ করা হয় এই ফ্রন্ট এ ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর। এ দাবি করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে শুধু ডিফেন্স, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রা বাদে।

এটাকে বলা হয় দেশে বাংলা ভাষাকে পূর্ণ জীবিত করা। ১৯৫২ সালে শহীদ মিনারের সামনে পুলিশ গুলি ছুড়ল যার কারণ ২১ শে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন করা, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্বশাসন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার কলকারখানার শ্রমিকদের ILO (International Labour Organization) এর মূলনীতির সাথে মিল রেখে, পাটকে জাতীয়করণ করা, দ্রব্য মূলের ন্যায্য মূলধার্য।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন জয়লাভ করে ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন পেয়ে। যেখানে মুসলিম লীগ পেয়েছিল ৯টি আসন। ১২৮৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক প্রার্থী এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে ৯৮৬ জন প্রতিযোগী ছিল, ২২৮টা মুসলিম আসনে, সাধারণ ৩০টা আসনে ১০১ জন প্রার্থী এবং অন্যান্য ৩৬টা আসনে ১৫১ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করে। ৩৭ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় ৯টা আসনে। যা ছিল মুসলিম মহিলাদের জন্য বরাদ্দকৃত। যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা দখল করলো মহিলাদের জন্য বরাদ্দকৃত আসনগুলো।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এই যুক্তফ্রন্টে জয়লাভ করেন। এই জয় ছিল বাংলার জন্য সত্যিই চমকপ্রদ ঘটনা।

www.pathagar.com

যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা

একুশ দফা দাবির মূল উদ্দেশ্য ছিলো একত্রে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন করা। যুক্তফ্রন্ট গঠিত ছিলো পূর্ববাংলার চারটি রাজনৈতিক দল নিয়ে। আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক লীগ, নিজাম-ই ইসলাম ও গণতান্ত্রিক দল। যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় ১৯৫৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর এই নির্বাচনে আওয়ামীলীগ অধিকাংশ আসন পায় এবং তাঁদের আসন সংখ্যা ছিলো ১৪৩টি। একুশ দফা দাবি নিম্নে দেওয়া হলো :

নীতি : কোরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১. বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ত উচ্ছেদ রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে। এবং উচ্চ হারের খাজনা ন্যায় সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হবে।

৩. পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাট চাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেঙ্কারী তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪. কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্ত শিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

৫. পূর্ববঙ্গকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করা হইবে। এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণের কেলেঙ্কারী সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণির গরিব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে।

www.pathagar.com

এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করিয়া কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারি বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভূক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২. শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া ও নিম্নবেতন ভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসংগত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজারের বেশি বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি বেসরকারি পদাধিকারীর ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করতঃ বিনা বিচারে আটক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

www.pathagar.com

১৭. বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮. ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশ রক্ষা বিভাগের স্থল বাহিনীর হেড কোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করত পূর্বপাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোনো অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পরপর তিনটি উপ-নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।

www.pathagar.com

১৯৫৬ সালের সংবিধান

Pakistan became independent of the United Kingdom in 1947, but remained a British Dominion like Canada or Australia until 1956. Under Section 8 of the Indian Independence Act, 1947, the Government of India Act 1935 with certain adaptations, served as the working constitution of Pakistan, but the need of a full independence and a constitution to be framed by the elected representatives of the people was all the more necessary for the free citizens of a sovereign state. Therefore, the first Constituent Assembly was formed under the Independence Act and was entrusted with two separate functions :

- To frame a Constitution for the country, and
- To set as a Federal Legislative Assembly or Parliament until that Constitution came into effect.

  The powers and functions of the central legislature under the Government of India Act were conferred on the Constituent Assembly. The Constituent Assembly could, however, amend the Indian Independence Act, 1947 or the Government of India Act, 1935, and no Act of the British Parliament could be extended to Pakistan without legislation by the Constituent Assembly. The first Constituent Assembly originally consisted of 69 members; subsequently the number of members was increased to 79.

  After assuming charge as Prime Minister, Chaudhary Muhammad Ali and his team worked hard to formulate a

www.pathagar.com

constitution. The committee, which was assigned the task to frame the Constitution, presented the draft Bill in the Constituent Assembly of Pakistan on January 9, 1956. The bill was opposed by the Bengali autonomists. Bhashai, the leader of Awami League in East Pakistan, even used the threat of secession to press for autonomy and his party staged a walkout from the Assembly on February 29, when the Assembly adopted the Constitution. Later on, Awami League boycotted the official ceremonies celebrating the inauguration of the Constitution. However, in spite of their opposition, the Constitution was adopted and was enforced on March 23, 1956. With this Pakistan's status as a dominion ended and the country was declared an Islamic Republic of Pakistan. Constituent Assembly became interim National Assembly and Governor-General Iskander Mirza sworn in as the first President of Pakistan.

The Constitution of 1956 consisted of 234 articles, divided into 13 parts and 6 schedules. Following were the chief characteristics of the Constitution :

1. Pakistan was declared as an Islamic Republic and it was made mandatory that only a Muslim could become the President of the country. President would set up an Organization for Islamic Research. Good relations with the Muslim countries became the main objective of the Foreign Policy. Objectives Resolution and Quaid's declaration that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice were made the preamble of the Constitution. Steps were to be taken to enable the Muslims individually and collectively to order their lives in accordance with the teaching of Quran and Sunnah and to implement Islamic moral standards. The sectarian interpretations among the Muslims were to get due regard. Measures were to be taken to properly organize zakat, waqfs, and mosques. However, one clause relating to the elimination of riba, which was the part of the draft was eventually dropped.

www.pathagar.com

2. The constitution provided for the federal form of government with three lists of subjects: federal, provincial and concurrent. The federal list consisted of 33 items, provincial of 94 items and concurrent list of 19 items. The federal legislation was to get precedence over provincial legislation regarding concurrent list. In case of a conflict between federal and provincial governments, or between the provincial governments, Chief Justice of the Supreme Court was to act as a mediator. Federal government exercised wider control in provincial matters in case of emergency.
3. Though the constitution provided for the Parliamentary form of Government, yet it declared that the executive authority of the Federation would be in the president.
4. Any Muslim citizen of Pakistan, who was at least forty years old, could be elected as the President of Pakistan for the term of five years. No one was entitled to hold this office for more than two tenures. 3/4th members of the Assembly could impeach the president.
5. President could appoint from amongst the MNAs a Prime Minister who had to take the vote of confidence from the house in two months. The Prime Minister had to inform the president about all the decisions of the cabinet.
6. Ministers could be taken from outside the National Assembly but they were to get themselves elected within six months.
7. President had the power to summon, prorogue, and dissolve the Assembly on the advice of the cabinet. No bill imposing taxes or involving expenditure could be moved without his consent. He had partial veto power. He could give or withhold his assent to a bill passed by the Assembly.
8. Prime Minister and his cabinet were to aid and advise the president. The president was required to follow the advice of the cabinet except where he was empowered to act in his own discretion.

www.pathagar.com

9. The Constitution entitled for a Unicameral Legislature. The National Assembly was to consist of 300 members. Age limit of a candidate for a seat in National Assembly was 25 years.
10. Principle of parity was accommodated in the Constitution. West Pakistan was treated as one unit and seats were divided equally between the two wings of the country. National Assembly was to meet at least twice a year. Minimum of one session should be held at Dhaka.
11. Members of the Assembly were to be elected on the basis of Direct Elections conducted on the basis of Adult Franchise. However, for the first ten years five additional seats were reserved for women from each wing. Every citizen, who was more than 21 years in age was considered as an adult.
12. The provincial structure was similar to that of the center. There were 300 members in both provincial assemblies. Ten additional seats were reserved for women. Punjab was given 40% seats in the West Pakistan Assembly.
13. It was a Written Constitution.
14. It was a Flexible Constitution and two third members of the Assembly could bring amendment in the constitution.
15. Fundamental Rights were made justiciable. However, the President had power to suspend the fundamental rights in case of emergency.
16. Elaborate provisions were made for the higher judiciary to ensure its independence.
17. Urdu and Bengali were declared as the state languages. However, for the first twenty years English was to continue as an official language. After ten years, the president was to appoint a commission to make recommendations for the replacement of English.

www.pathagar.com

The constitution was never practically implemented as no elections were held. It was eventually abrogated on October 7, 1958 when Martial Law was enforced.

Thereupon the **Constituent Assembly of Pakistan** became the interim National Assembly and Governor General Iskander Mirza was sworn in as the first President of **Pakistan**. The Constitution of 1956 consisted of 234 articles, which were divided into 13 parts and 6 schedules.

www.pathagar.com

Ayub Khan's Basic Democracy

Democracy, or democratic government, is "a system of government in which all the people of a state or polity ... are involved in making decisions about its affairs, typically by voting to elect representatives to a parliament or similar assembly," as defined by the Oxford English Dictionary. Democracy is further defined as "government by the people; especially : rule of the majority" a government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly through a system of representation usually involving periodically held free elections."In a democracy, every citizen has certain basic rights that the state cannot take away from them. These rights are internationally recognized and guaranteed. Everyone has the right to have their own beliefs, including their religious beliefs, and to say and write what they think. Everyone has the right to seek different sources of information and ideas. Everyone has the right to associate with other people, and to form and join organizations of their own choice, including trade unions. Everyone has the right to assemble and to protest government actions. However, citizens have an obligation to exercise these rights peacefully, with respect for the law and for the rights of others.

Basic Democracies a local government system introduced during the Ayub regime in the early 1960s. General Ayub Khan, President of Pakistan, introduced the concept of basic democracy under the Basic Democracies Order, 1959 having made an attempt to initiate a grass-root level democratic system. Of course, most of the political parties

www.pathagar.com

of East Pakistan had different ideas about his scheme, and considered it a bid to usurp power in the hands of Ayub Khan and other vested groups.

The system of Basic Democracies was initially a five-tier arrangement. They were : (i) union councils (rural areas), town and union committees (urban areas); (ii) thana councils (East Pakistan), tehsil councils (West Pakistan); (iii) district councils; (iv) divisional councils; (v) provincial development advisory council.

At the base of the system was the union council which consisted of a chairman and usually about 15 members. It had both elected and nominated members. Two-thirds of the members were elected representatives and one-third consisted of non-official members nominated by the government. However, the nomination was abolished by an amendment in 1962. The members of the council were elected by the people from their respective unions on the basis of universal adult franchise. The chairman of the council was elected by the members from amongst themselves. In a way, it was at par with the erstwhile union board with minor differences. The elected representatives of the union council were called basic democrats. The total number of such councils was 7300.

In the second tier was the thana council which consisted of ex-officio representative members, official and non-official members. The representative members were the chairmen of the union councils and town committees. The official members were the representatives of various nation-building departments of a thana and their number was fixed by the district magistrate of the concerned district. The total number of official members could not in any case exceed the number of non-official members. The council was headed by the Sub-Divisional Officer (SDO) who was the ex-officio chairman. In his absence the Circle Officer (development) would preside over the meetings of the thana council as ex-officio member. In case of West Pakistan, the thana was known as tehsil and it was presided over by a tehsilder. In all, there were 655 thanas and tehsils in Pakistan.

www.pathagar.com

The third tier was the district council. It consisted of one chairman, official and non-official members. The number of members would not exceed 40. The chairmen of thana councils were its members, and other official members were drawn from district level officers of development departments and an equal number of non-official members. At least 50% the non-official members was drawn from amongst the chairmen of union councils and town committees. The district magistrate acted as chairman of the council while the vice-chairman was elected by the elected members of the council.

In absence of the chairman the vice-chairman had to perform such other functions assigned by the chairman. There were 74 district councils in Pakistan. The district council was the most important tier in the basic democracy system. It was the successor organisation to the district board. So far as the composition of the council was concerned, it regressed beyond its 1885 position when 25% members were nominated.

The fourth and the apex tier was the divisional council. The Divisional Commissioner was the ex-officio chairman of the council. It had both official and non-official (representative) members. The maximum number of members was 45. Official members consisted of the chairmen of district councils of the concerned division and representatives of development departments. The total number of divisional councils was sixteen.

Basic democracies specified a provincial development advisory council for each wing. Its composition followed the pattern of the divisional council except that only one-third of the appointed members had to be selected from union council chairmen. The council did not have any power. However, it was dropped with the introduction of provincial assemblies in both East and West Pakistan.

Of the five councils created by the Basic Democracies Order only the union and district councils had been given specific functions. The divisional and thana council performed mostly coordinative functions.The union council had been entrusted with a variety of functions such as agriculture, small industry, community

www.pathagar.com

development and increased food production in the union. It maintained law and order through the rural police and had been given judicial powers to try minor civil and criminal cases through its conciliation courts. The union councils were given the responsibility of planning and implementing rural public works programmes for construction of roads, bridges and culverts, irrigation channels and embankments. The union council was empowered to levy taxes, impose rates, tolls and fees. The most important feature of the basic democracy system was that it formed the national electoral college consisting of 80,000 members from East and West Pakistan for the elections of President, members of national assembly and of the provincial assemblies.

The thana/tehsil council was mostly a coordinative and supervisory body. All the activities of union councils and town committees falling within its jurisdiction were coordinated by it. All development plans prepared by the union councils and town committees were coordinated by the thana council including supervision of on-going schemes. It followed the directions of the district council and remained responsible to it.

The district council had been entrusted with three types of functions: compulsory, optional and coordinating. Some of the compulsory functions included construction of public roads, culverts, bridges, maintenance of primary schools, plantation and preservation of trees, regulation of public ferries, and improvement of public health. Optional functions included education, culture, socio-economic welfare, and public works. In addition, the district council was also given broad functions such as agriculture, industry, community development, promotion of national reconstruction and development of cooperatives. Coordination of all activities of local councils within the district was also a responsibility of the district council. The council was supposed to formulate schemes and projects taken by nation building departments and make suggestions for further improvement and development and

www.pathagar.com

recommend them to the divisional council and other concerned authorities. The fourth tier, the divisional council, was least important functionally. It was simply an advisory body at that level.

Apart from being the agent of local government, the basic democracies also performed political and electoral functions to legitimize the government through popular support and participation. In the referendum for presidential elections held on 14 February 1960 the basic democrats voted for Ayub Khan. The monopolisation of electoral rights by the basic democrats was strongly despised by the vast rural and urban masses, which led to mass upheaval against Ayub in 1969. As a political institution it not only failed to legitimize the regime, but also in fact lost its legitimacy after the fall of General Ayub in 1969. [From Banglapedia topics written by Shamsur Rahman]

The Basic Democracies system set up five tiers of institutions. The lowest but most important tier was composed of union councils, one each for groups of villages having an approximate total population of 10,000. Each union council comprised ten directly elected members and five appointed members, all called Basic Democrats. Union councils were responsible for local agricultural and community development and for rural law and order maintenance; they were empowered to impose local taxes for local projects. These powers, however, were more than balanced at the local level by the fact that the controlling authority for the union councils was the deputy commissioner, whose high status and traditionally paternalistic attitudes often elicited obedient cooperation rather than demands.

www.pathagar.com

Tashkent Declaration

The Tashkent Declaration was a peace agreement between India and Pakistan signed on 10 January 1966 that resolved the Indo-Pakistani War of 1965. Peace had been achieved on 23 September by the intervention of the great powers who pushed the two nations to cease fire, afraid the conflict could escalate and draw in other powers.
The conference was viewed as a great success and the declaration that was released was hoped to be a framework for lasting peace. The declaration stated that.

- Indian and Pakistani forces would pull back to their pre-conflict positions, pre-August lines, no later than February 25, 1966.
- The nations would not interfere in each other's internal affairs.
- Economic and diplomatic relations would be restored.
- Orderly transfer of Prisoners of War.
- The two leaders would work towards building good relations between the two countries.

The declaration at a glance :

1. A meeting was held in Tashkent in the Uzbek SSR, USSR (now Uzbekistan) from 4-10 January 1966 to try to create a more permanent settlement.
2. The Soviets, represented by Premier Alexei Kosygin, moderated between Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri and Pakistani President Muhammad Ayub Khan.

www.pathagar.com

3. The Tashkent conference, under United Nations, American and Soviet pressure, compelled India to give away the conquered region in Pakistan and the 1949 ceasefire line in Kashmir.

শেখ মুজিবের ৬ দফা

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি পেশ করলেন লাহোরে। এ দাবি সে পূর্ব পাকিস্তানের সরকার প্রধান এর কাছে করেছিলো। ইন্ডিয়ায় ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তান নতুন রাজ্য হিসেবে যাত্রা শুরু করলো। সে সময়ে অধিকাংশ জনসংখ্যা ছিলো পূর্ব পাকিস্তানের। এবং সে সময়ে পাকিস্তানের রপ্তানিকৃত পণ্যের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) পাট ছিলো প্রধান পণ্য। যাইহোক, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এটা উপলব্ধি করতে পারলো না যে, তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা পাকিস্তানের সাথে ভাগ করে দিতে হচ্ছে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের এক সময়ে মহাসংকটের সম্মুখীন হতে হলো। ১৯৬৬ সাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামীলীগ এর জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি লাহোরে ৬ দফা দাবি জানালেন যা পূর্ব পাকিস্তানের গণতন্ত্র ও অধিকার আদায়ের পক্ষে দলিল। ৬ দফা দাবি নিম্নে দেওয়া হলো :

প্রস্তাব-১ :
শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি :
দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমনি হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। সরকার হবে পার্লামেন্টারি ধরনের। আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম। এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

প্রস্তাব-২ :
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা:
কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল দু'টি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে– যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

www.pathagar.com

প্রস্তাব-৩ :

মুদ্রা বা অর্থ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা :

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দু'টির যে কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে :

(ক) সমগ্র দেশের জন্যে দু'টি পৃথক, অথচ অবাধে বিনিময় যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে।

অথবা

(খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্যে কেবল একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভেরও পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক বা অর্থবিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাব-৪ :

রাজস্ব, কর, বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা :

ফেডারেশনের অঙ্গরাজ্যগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর সব রকমের করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব-৫ :

বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা :

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাজ্যের বহির্বাণিজ্যের পৃথক পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

(খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাজ্যগুলোর এখতিয়ারাধীন থাকবে।

(গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোনো হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোই মিটাবে।

(ঘ) অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্য চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা করজাতীয় কোনো বাধা-নিষেধ থাকবে না।

(ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

www.pathagar.com

প্রস্তাব-৬ :

আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা :

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

This chart shows us the difference between West Pakistan & East Pakistan movement :

Year	Spending on West Pakistan (in crore rupees)	Amount spent on West as percentage of total	Spending on East Pakistan (in crore rupees)	Amount spent on East as percentage of total
% of total population		**36.23**		**63.77**
1950–55	1,129	68.31	524	31.69
1955–60	1,655	75.95	524	24.05
1960–65	3,355	70.5	1,404	29.5
1965–70	5,195	70.82	2,141	29.18
Total	**11,334**	**71.16**	**4,593**	**28.84**

The Six-point Programme along with a proposal of movement for the realisation of the demands was placed before the meeting of the working committee of Awami League on 21 February 1966, and the proposal was carried out unanimously. A booklet on the Six-point Programme with introduction from Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and Tajuddin Ahmad was published. Another booklet titled Amader Banchar Dabi: 6-dafa Karmasuchi (Our demands for existence: 6-points Programme) was published in the name of Sheikh Mujibur Rahman, and was distributed in the council meeting of Awami League held on 18 March 1966.

www.pathagar.com

ছাত্রদের ১১ দফা

পাকিস্তানের আবালবৃদ্ধবনিতা, ছাত্র-জনতা, কৃষক-মজুর, মেহনতী শিক্ষক, ডাক্তার-কবিরাজ, রিকশাওয়ালা, ডোম-মেথর, মাঝি-কুলি, দেশের সকল শ্রেণি, সকল স্তরের মানুষ এক বাক্যে সমস্ত অন্তর দিয়ে ঐতিহাসিক ১১ দফা সমর্থন করেছিল। ১১-দফাকে তাদের প্রাণের দফা বলে স্বীকার করে নিয়েছিল।

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছাত্র জনতার ১১ দফার সমর্থনে সুস্পষ্ট এবং দ্বিধাহীনভাবে বলেছিলেন, ছাত্রদের ১১ দফা সারা পাকিস্তানের ১২ কোটি জনতার দাবি। এই ১১ দফা সঠিকভাবে কায়েম হলে আমাদের দলের ১৪ দফাও বহুলাংশে কায়েম হয়ে যাবে। সুতরাং ১১ দফার জন্যে শুধু ছাত্ররাই জীবন দেবে কেন? এই ১১ দফার জন্যে কৃষক-মজুর, মেহনতী মজলুম জনগণও অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিবে।

এই ১১ দফার আন্দোলনের কৃষক সমিতির সদস্য ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান প্রথম শহীদ হন। এই ১১ দফা দাবির ওপর তিনি রক্তের স্বাক্ষর অঙ্কিত করে অমর হয়ে রয়েছেন। শত শত ছাত্র-জনতার প্রাণরক্তে জনতার মুক্তিসনদ ১১ দফা লেখা হয়ে গেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের বিশেষ জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান লক্ষাধিক জনতার সামনে সুস্পষ্টভাবে ওয়াদা করেছিলেন, ১১ দফা দাবির ভেতরে আমাদের দলের ৬ দফাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং ছাত্রদের ১১ দফা কায়েম করার সংগ্রামে আমরাও শরিক হবো। তিনি প্রসঙ্গক্রমে আরও বলেন যে, ছাত্র-জনতা আমাকে ফাঁসির কবল থেকে মুক্ত করে এনেছে। তাদের সাথে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করব না, করতে পারি না।

জনতার রক্তের কালিতে লিখা সেই ঐতিহাসিক ১১ দফা নিম্নে দেওয়া হলো :

(ক) সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং কলেজসহ প্রাদেশিকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

www.pathagar.com

(খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্ত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।

(গ) প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আইএ, আইএসসি, আইকম ও বিএ, বিএসসি, বিকম এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ এমএ ও এমকম ক্লাস চালু করিতে হইবে।

(ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ডের সংখ্যা সৃষ্টি করিতে হইবে এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

(ঙ) হল, হোস্টেলের ডাইনিং হল, ক্যান্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক সাবসিডি হিসেবে প্রদান করিতে হইবে।

(চ) হল ও হোস্টেল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

(ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস-আদালতে মাতৃভাষা বাংলা চালু করিতে হইবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করতে হইবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।

(জ) অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।

(ঝ) মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশন ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের দাবি মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

(ঞ) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সুব্যবস্থা, প্রকৌশলী ছাত্রীদের শেষ বর্ষেও ক্লাস দেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

(ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের কনডেন্স কোর্স-এর সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিস্টার পরীক্ষা ভিত্তিতেই ডিপোমা দিতে হইবে।

www.pathagar.com

(ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজের ছাত্রদের সকল দাবি অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে। আইইইআর ছাত্রদের দশ-দফা; সমাজকল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এমবিএ ছাত্রদের ও আইনের ছাত্রদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা 'ফ্যাকাল্টি' করিতে হইবে।

(ড) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবি মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের কনডেন্স কোর্সের দাবিসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

(ঢ) ট্রেনে, স্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের আইডেন্টিকার্ড দেখাইয়া শতকরা ৫০ ভাগ কন্সেশনে টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকেটও এই কন্সেশন দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মতো বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোনো স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাসে যাতায়েতের শতকরা ৫০ ভাগ কন্সেশন দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারি ও আধা সরকারি উদ্যেগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ কন্সেশন দিতে হইবে।

(ণ) চাকরির নিশ্চয়তার বিধান নিশ্চিত করিতে হইবে।

(ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে। এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

(থ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সঙ্কোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করিতে এবং ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২. প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩. নিম্নলিখিত দাবিসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবেঃ

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

www.pathagar.com

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের মধ্যে একটা মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেশন রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোনো কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহিঃবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে। এবং বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির প্রক্রিয়াধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশি মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গরাষ্ট্রগলির মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলিবে। এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশি রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রপ্তানি করিবার অধিকার অঙ্গরাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

(চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন করিতে হইবে।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতঃ সাব ফেডারেশন গঠন।

৫. ব্যাংক বিমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬. কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহসিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের

www.pathagar.com

সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্যমূল্য দিতে হবে।

৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮. পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯. জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহারের এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পক্ষে :
আবদুর রউফ, সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।
খালেদ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।
সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। (মতিয়া গ্রুপ)
সামসুদ্দোহা, সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
মোস্তফা জামাল হায়দার, সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। (মেনন গ্রুপ)
দীপা দত্ত, সহ-সম্পাদীকা
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
তোফায়েল আহমদ, সহ-সভাপতি
ডাকসু।
নাজিম কামরান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক
ডাকসু।

www.pathagar.com

১৯৫৪ সালের ১৯শে এপ্রিল বাংলা এবং উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মেনে নিলেও বাংলার সত্যিকারের মুক্তি লাভ হয়নি। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে যে, স্বাধীকারের কথা ছিলো পশ্চিম পাকিস্তান শাষকগোষ্ঠী তার ধারকাছ দিয়েও হাঁটছিলো না। বরং প্রতি পথে পথে বিস্তার করছিল ষড়যন্ত্রের জাল। কখনো কখনো ভাবতেও দুঃখ লাগে এই ভেবে যে, বাংলার কোনো কোনো অবিসংবাদিত নেতা বারবার সেই ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট কৃত্রিম দলাদলির সুযোগ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বারবার আমাদের স্বাধীকারের প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। তৎকালীন নেতাদের এই সব ভুলই পরবর্তী সময় বাঙালিকে এক সাগর রক্ত দিয়ে পরিশোধ করতে হয়েছে। এর উপযুক্ত প্রমাণ ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা। সেই দিন যদি বাঙালি তার সাফল্যকে ধরে রাখতে পারত তা হলে আজ বাঙালির ইতিহাস অন্য রকম হতে পারত। কিন্তু যা হয়নি তা নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। ইতিহাস আসলে তা-ই বলে। কারণ রাজনীতি সবসময়ই রহস্যময়। আর এসব অবকাশের মধ্য দিয়েই পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে সরিয়ে ক্ষমতায় এলেন আইয়ুব খান। তারপর প্রায় একযুগ। সে এক সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। আইয়ুবের শাসন আমলেই ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের এক অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ছয়দফা উপস্থাপন করেন। ছয়দফাকে তিনি বাঙালির 'বাঁচার দাবি' উল্লেখ করেছিলেন। পরবর্তী সময় এই ছয়দফাই বাঙালির জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ফলাফলের মধ্য দিয়ে ১৯৬৯ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি মুজিবের মুক্তির মধ্য দিয়ে তা সমাপ্তির দিকে যায়। পতন ঘটে স্বৈরাচারী আইয়ুব শাহীর। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ক্ষমতার মঞ্চে আরোহণ করেন ইয়াহিয়া খান। ক্ষমতায় আরোহণ করেই তিনি সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি এসে নানা কথার মায়াজাল বিস্তার করেন। Legal Framework Order ১৯৭০ করলেন সংস্কারের উদ্দেশ্যে। সবই আশা। কিন্তু সত্যিকারের লক্ষ্যে যে স্বাধীকার, তাতো অর্জিত হচ্ছিল না। তাই তো প্রয়োজন হলো '৭০-এর নির্বাচন। রায় হলো বাঙালির পক্ষে। কিন্তু কে মানবে এই রায়। শুরু হলো রাজনৈতিক জটিলতা। অতঃপর যুদ্ধ।

www.pathagar.com

১৯৬৯ : ফিরে দেখা

বাঙালির জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধ একদিনে সংঘটিত হয়নি। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় তখনই গলায় মাছের কাঁটার মতো বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। ভৌগোলিক দূরত্বকে বাদ দিলেও পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক কিংবা ভাষাগত কোন বিষয়েই মিলছিল না। আর সবচেয়ে বড় কথা বাংলাদেশকে পূর্ব-পাকিস্তান এবং পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হিসেবে আখ্যায়িক করা হলেও বাংলাদেশকে কিছুতেই পাকিস্তানের সাথে আত্মীয়করণ করা যায়নি। এটা সম্ভবও ছিল না। হাজার হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষের যে বৈশিষ্ট্যগত পরিচয় তা কি নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে এতো সহজে মুছে ফেলা যায়। অবশ্য তা সম্ভবও হয়নি। ২৩ বছর পাকিস্তানি শাসনামলে বাঙালির জন্য বঞ্চনা ছাড়া আর কিছু ছিলো না। পাকিস্তানীরা কখনোই বাংলদেশকে তাদের শরীরের অংশ হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। অবশেষে ১৯৭১-এ এসে সেই অঙ্গকে কেটে ফেলতে হলো। জন্ম হলো স্বাধীন বাংলাদেশের। কিন্তু স্বাধীনতার পথের এই অগ্রযাত্রা এতোটা সহজ ছিলো না। অনেক চড়াইউৎরাই পেরিয়ে তবেই এতোদূর আসা। এই পথ-পরিক্রমায় সবচেয়ে-ঘটনাবহুল হলো ১৯৬৯। ১৯৬৯-কে তুলে ধরলেই বোঝা যাবে বাংলাদেশ কিভাবে স্বাধীনতার পথে এগিয়েছিলো।

ফিরে দেখা অতীত : ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরেই গঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১লা সেপ্টেম্বরে গঠিত তমুদ্দুন মজলিসের সদস্য অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া—আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে সংসদ সদস্য শামসুল হকের নেতৃত্বে আর একটি নতুন কমিটি গঠিত হয়। সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত সংসদে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন, কিন্তু প্রস্তাবটি ব্যর্থ হয়।

www.pathagar.com

১৯৪৮ সালে জিন্নাহ পূর্ব বাংলা সফরে এসে ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের এক ভাষণে প্রকাশ্যে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। ২৪ শে মার্চ কার্জন হলের জনসভায় দ্বিতীয় বার তিনি একই ঘোষণা দেন, ২৮ শে মার্চ ঢাকা ত্যাগের পূর্বে রেডিওতে প্রকাশিত তার ভাষণেও তিনি তার এই উর্দু নীতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

অনেক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে অবশেষে আসে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। ভাষার জন্য বেশ কিছু তাজা প্রাণ ঝরে পড়ে। '৬৯-এর শহীদেরা হলেন শহীদ আমানুল্লাহ আসাদুজ্জামান (১০ জুন ১৯৪২-২০ জানুয়ারি ১৯৬৯), শহীদ মতিউর রহমান মল্লিক (২০ শে জানুয়ারি ১৯৬৯), শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক (১৯৩৯- ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯), শহীদ সামসুজোহা (১৯৩৪-১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯)।

রাজপথ রঞ্জিত হয় দেশ প্রেমিকের তাজা রক্তে। অবশেষে ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ভাষা সমস্যার সমাধান হলেও আরও অনেক জটিলতা পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে তোলে। আর এরই ধারাবাহিকতায় '৬২, '৬৬ পেরিয়ে অবশেষে '৬৯।

www.pathagar.com

Legal Framework Order 1970

The Legal Framework Order, 1970 (LFO) was a decree issued by then-President of Pakistan Gen. Agha Muhammad Yahya Khan that laid down the political principles and laws governing the 1970 general election, which were the first direct elections in the history of Pakistan. The LFO also dissolved the "One Unit" scheme of West Pakistan, re-establishing the four provinces of Punjab, Sindh, Balochistan and the Northwest Frontier Province.

Yahya Khan after becoming the Chief Martial Law Administrator in 1969 announced that he would make it possible that free and fair elections will be conducted in Pakistan and a new constitution will be made soon. For that reason, he introduced a Legal Framework Order in March 1970 that determined principles for the future constitution of Pakistan. It also dissolved the One-Unit scheme on 1st July 1970.

The features of the **LFO 1970** are mentioned as under :

1. The National Assembly of Pakistan will consist of 313 seats with 13 seats reserved for women. Out of 313, 169 seats were to be for East Pakistan, 85 for Punjab, 28 for Sindh, 19 for NWFP, 5 for Baluchistan and 7 seats were allotted to the tribal areas.
2. Each province will have a provincial assembly consisting of elected members. East Pakistan provincial assembly will have 400 members, Punjab 186, Sindh 62, Baluchistan 21 and NWFP 42.

www.pathagar.com

3. The elections for National Assembly will be held on 5 October 1970 and for provincial assemblies not later than 22 October.
4. The new constitution of Pakistan will follow these principles :

a. Pakistan will be a Federal Republic and will be known as Islamic Republic of Pakistan.

b. The head of the Pakistan state would be a Muslim and the divinity of Islam will be preserved.

c. The principles of democracy will prevail by holding free elections for federal and provincial legislatures on the basis of adult franchise. Independent judiciary will be made possible along with fundamental rights for the citizens.

d. All provinces will be given maximum autonomy while the centre will also remain strong.

e. The citizens of the country will be able to participate actively in the affairs of the state and the state will try to eliminate economic disparities in the society.

f. The constitution of the country will make it possible for the Muslims of Pakistan to live their lives according to the teachings of Islam. The minorities will be free to follow their own faiths and will be able to enjoy the benefits of citizenship along with their fellow Pakistanis.

g. The LFO clarified the status of national and provincial assemblies. It stated that the National Assembly would either be the only legislature provided that federal legislature consisting of one house or it would be the lower house if federation has two houses. Its tenure would be for the full term in both cases. The same went for provincial assemblies.

h. Within 120 days of the first meeting of the National Assembly, it would form a constitution bill and if it fails to do so, it will dissolve.

5. After the elections of the National Assembly, provisions will be made to arrange its meetings.

www.pathagar.com

6. The LFO set broad outlines, structures, conditions and qualifications. Any contesting political party failing to qualify these conditions would not be able to participate in the elections.

The LFO met a long-standing demand of Bengalis by accepting proportional representation, to the chagrin of many West Pakistanis who resisted the notion of an East Pakistani-led government. In the 1970 elections, the Awami League won all but two seats from East Pakistan, gaining a majority in the National Assembly and thus not needing the support of any West Pakistani political party. As the LFO had not laid down any rules for the process of writing a constitution, an Awami League-controlled government would oversee the passage of a new constitution with a simple majority. The Pakistan Peoples Party of Zulfiqar Ali Bhutto, which had emerged as the largest political party in West Pakistan, declared it would boycott the new legislature, which severely aggravated tensions. After the failure of talks, Gen. Yahya postponed the convening of the legislature, a decision that provoked outright rebellion in East Pakistan and consequently led to the Bangladesh Liberation War in 1971.

www.pathagar.com

১লা মার্চ-২৫শে মার্চ : উত্তাল দিনগুলো

১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনের মাধ্যমে যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল আইয়ুব খান তাকে প্রশমিত করার জন্য এর কুশীলবদের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে দেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হয়। বাঙালি আরও বেশি ফুসে ওঠে। ১৯৬৯-এর শুরুতে এসে আন্দোলন যেন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ৪ঠা জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের ১১ দফা পেশ করে। এই ১১ দফার মধ্যে ছয় দফার দাবিগুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ৭ ও ৮ ই জানুয়ারি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য গণতন্ত্র বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয়। ক্রমশ পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। ২০শে জানুয়ারি ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হন। পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়। সারা দেশে আগুন জ্বলে ওঠে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি কুর্মিটোলার ক্যান্টনমেন্টে সার্জেন্ট জহুরুল হক নিহত হন। ঘটনা প্রবাহ আরও জটিল আকার ধারণ করে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে শান্তিপূর্ণ সমাবেশে গুলি চালালে ড. সামসুজ্জোহা নিহত হন। অবশেষে বাধ্য হয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামালা তুলে নিতে বাধ্য হন। শেখ মুজিবের সঙ্গে এবং সকল আসামীকে মুক্তি দেন। ২৩ শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে এক বিশাল গণসংবর্ধনা দেওয়া হয় সেখানকার কমিটির পক্ষ থেকে তোফায়েল আহম্মেদ শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন। উপায়ান্তর না দেখে আইয়ুব খান ১০-১৩ ই মার্চ এক গোল টেবিল বৈঠকের আহব্বান করেন। কিন্তু এর পরেও তার শেষ রক্ষা হয়নি। ২৪শে মার্চ তৎকালীন সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াইয়া খানের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসক আইয়ুব খান ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান।

এর পর এলো ১৯৭০ সালের নির্বাচন। যুগান্তকারী এই নির্বাচনে আওয়ামীলীগ তার শরিক দলগুলোসহ নিরঙ্কুর বিজয় লাভ করে। ন্যাশনাল এসেম্বলির ৩০০ টি আসনের মধ্যে ১৮০ টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বিজয় লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদের তার আসনের মধ্যে ২৮৮ টিতে জয়লাভ

www.pathagar.com

করে। অপরদিকে পাকিস্তান পিপলস পার্টি ১৩৮টি আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৮১টি আসনে জয়লাভ করে। দ্বিতীয়ত, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস এসে উপস্থিত হয়। ১ তারিখে ইয়াহিয়া খানের ভাষণ দেয়ার কথা থাকলেও তারই পক্ষ থেকে কেউ একজন একটি ঘোষণা পড়ে শোনান । ঘোষণায় পরবর্তী তারিখ ঘোষণা পর্যন্ত ন্যাশনাল এসেম্বেলির বৈঠক স্থগিত করা হয়। জনতা নেমে আসে। ২রা মার্চ সারাদেশে সকাল ৮ টা থেকে ৭ টার মধ্যেই তৎকালীন ছাত্র রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থানকারী ডাকসুর সভাপতি আ. স. ম আব্দুর রব এবং সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ, নূরে আলম সিদ্দিকি এবং আব্দুল কুদ্দুস মাখনের নেতৃত্বে একটি র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালী শেষে আ. স. ম আব্দুর রব বট তলায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। বর্তমান পতাকা ঐ পতাকার অনুরূপ। শুধু তৎকালীন পতাকাটিতে সূর্যের মাঝখানে বাংলাদেশের মানচিত্র ছিলো তা পরবর্তীতে বাদ দেওয়া হয়েছে।

৩রা মার্চ পল্টন ময়দানের জনসভায় শেখ মুজিবের উপস্থিতিতে আ. স. ম আব্দুর রব এবং শাহজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ঘোষণা পড়ে শোনান। তাদের মনে হয়েছিল শেখ মুজিব হয়তো আলোচনায় আসবেন আর জনতার এই তুমুল উত্তেজনা চাপা পড়ে যেতে পারে মুজিব অবশ্য শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে আগানোর কথা বললেন, ৪ঠা মার্চ শেখ মুজিব জনগণকে স্বাগতম জানালেন তার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য। তিনি যে সকল সরকারি, বেসরকারি কর্মচারীদের বেতন ভাতা পাননি তাদের বেতন ভাতা উত্তোলন করার করণের জন্য ২.৩০-৪.৩০ পর্যন্ত পরবর্তী দুদিন হরতাল চলাকালীন সময়ে অফিস খোলা রাখার জন্য বললেন টানা হরতালে দেশব্যাপী বহুলোকের প্রাণহানি হলো অবশেষে এলো সে মাহেন্দ্রক্ষণ, শেখ মুজিব লক্ষ জনতার উপস্থিতিতে রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ দিলেন।

www.pathagar.com

মূলত যুদ্ধ ছিলো অনিবার্য

When you go home
Tell them of us and say
For your tomorrow
We gave our today.

(Inscription chiseled into the living rock in the war memorial at kohima for those who feel in that World War II battle)

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট যখন পাকিস্তানের জন্ম হয় তখনই বাংলাকে তার সাথে অনেকটা অসংলগ্নভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৮-এর ভাষার জটিলতা প্রথম ফাটলটা সৃষ্টি করেছিল। আমার সব সময়ই মনে হয় ভাষা নিয়ে পাকিস্তানীদের নাড়াচাড়া করা ঠিক হয়নি। উর্দুর পাশাপাশি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশিদের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা কেন তারা বুঝতে পারেনি তা আজও বোধগম্য নয়। এই নাড়াচাড়া যে ভালো ফল বয়ে আনেনি তা পাকিস্তানিরা পরবর্তীতেও বুঝতে পেরেছিল কি-না আমার সন্দেহ। তা না হলে পাকিস্তানের জাতীয় বিষয়গুলোতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশগ্রহণের গুরুত্বটা তারা এড়িয়ে যেতো না। আসলে বিষয়টা ছিল "Master and Slave"-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর এখানেই ঘটল বিপত্তি। বাংলাদেশিরা খুব বেশিদিন স্লেভ হয়ে থাকতে চাইল না। ১৯৫৪ সালের ১৯শে এপ্রিল পাকিস্তান গণপরিষদ কর্তৃক বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৫৫ সালের ৭ই জুলাই মারী চুক্তির মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি ইউনিটে পরিণত করা হয়। ১৯৫৫ সালের ১৪ই অক্টোবর পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান করা হয়। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হয়। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানের সংবিধান বাতিল করে সামরিক শাসন জারি করা হয়।

www.pathagar.com

১৯৫৮ সালের ২৭ই অক্টোবর আইয়ুব খান পাকিস্তানের খণ্ডকালীন রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জাকে সরিয়ে দিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হন। এখানে বলে রাখা ভালো পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা যিনি ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

আইয়ুব খানের শাসনামলে অনেক বিতর্কিত আলোচিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলি রয়েছে। এর মধ্যে ১৯৬০ সালের ১৫ই জুন লাহোরে প্রণীত মৌলিক গণতন্ত্র, ১৯৬২ সালের কুখ্যাত হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারির নির্বাচনে আইয়ুব খান তার প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতেমা জিন্নাকে পরাজিত করেন। ১৯৬৬ সালের শুরুতেই কুখ্যাত হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এর পর পরই ১৯৬৬ সালের ১০ই জানুয়ারি তাশখন্দ চুক্তির কারণে আইয়ুব খান তার নিজ এলাকা পশ্চিম পাকিস্তানে যেমন বিরোধিতার মুখে পড়েছিলেন তেমনি ঐ বছরেরই ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে পেশ করা শেখ মুজিবের ছয় দফা পূর্ব পাকিস্তানেও তাকে বেকায়দায় ফেলেছিল। সব মিলিয়ে পুরো পরিস্থিতি এতোটাই ঘোলাটে যে আইয়ুব খানের পায়ের তলা থেকে আস্তে আস্তে মাটি সরে যাচ্ছিল।

১৯৬৬ সালের ৮ই মে আওয়ামী লীগের শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন ও খন্দকার মোশতাক পাকিস্তান দেশ রক্ষা আইনে গ্রেফতার হন। ১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি ১৯৬৬ সালের ৮ই মে থেকে আটক শেখ মুজিবকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেল গেট থেকেই আটক করে ঢাকা সেনানিবাসে প্রেরণ করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব এবং অন্যান্য) এর শুনানি শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের ২০শে জানুয়ারি ছাত্রনেতা আসাদুজ্জান নিহত হলে পরিণতি আরও ঘোলাটে হয়ে যায়। ১৫ই ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক নিহত হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া কর্তৃক সামরিক আইন জারি।

ইতিহাসের ঘটনা এভাবেই সামনে আগাচ্ছিল। মূলত পূর্ব পাকিস্তানকে ধরে রাখার মতো কোনো ইতিবাচক ঘটনাই এই দীর্ঘ সময়ে ঘটেনি। জেনারেল

www.pathagar.com

ইয়াহিয়া নিজেকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন শাসক হিসেবে। তার ক্ষমতাকে বৈধ করতে এর কোনো বিকল্প ছিল না।

১৯৬৯ সালের ২৮শে নভেম্বর ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের ১ ইউনিট বাতিল করার প্রস্তাব " লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার" ঘোষণা করেন। এতে বলা হয় "এক ব্যক্তি, এক ভোট"। ১৯৭০ সালের অক্টোবরে জাতীয় গণপরিষদের নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

রক্ত গঙ্গায় ভেসে ভেসে

Millions of babies watching the skies
Bellies swollen, with big round eyes on Jessore Road
Millions of fathers in rain
Millions of mothers in pain
Millions of brothers in woe
Millions of sisters no where to go.

[Allen Ginsberg : September on Jessore Road]

আমি যুদ্ধ দেখিনি। কারণ আমার জন্ম যুদ্ধেরও অনেক পরে। কিন্তু তাই বলে তো আর নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। মুক্তিযুদ্ধ একটি চিরন্তন বিষয়। এর থেকে দূরে থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আমাদের জাতীয় জীবনে বারবার ঘুরে ফিরে এই জিনিসটা চলে আসে। আমরা যারা যুদ্ধ দেখিনি তাদেরকে যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হয় শুনে, পড়ে এবং বুঝে। অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হয় চিন্তা শক্তির উপর। সব দিক থেকে হৃদয়ের আয়নায় যে ছবি ফুটে উঠে সেখান থেকেই আঁচ করে নিতে হয় মুক্তিযুদ্ধ আসলেই কেমন ছিল। হয়তো কখনো পুরোপুরি আন্দাজ করে নেওয়া সম্ভব নয়, তবুও সমস্ত জানাশোনা থেকে অর্জিত কল্পনা শক্তি বারবার ফিরিয়ে নিয়ে যায় যুদ্ধের সেই দিনগুলোতে। মা-বাবার স্মৃতি, পাড়াপড়শির কাছ থেকে শোনা এসবই সেই কাল্পনিক চিত্রের ভিত রচনা করে। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যুদ্ধ নিয়ে লিখতে ইচ্ছে করে। হাঁটতে ইচ্ছে করে স্বাধীনতা লাভের সেই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায়।

আর তাই তো প্রথমেই যুদ্ধের চিত্র যার কলমের কবিতা সবচেয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল সেই এলেন গিন্সবার্গে কবিতা *'September on Jessore Road.'*

www.pathagar.com

তার পরই যার ডাইরির লেখনিতে যুদ্ধের দিনগুলো আজও জীবন্ত মনে হয় সেই শহীদ জননী জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' থেকে যুদ্ধকালীন সময়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোর চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

৩রা মার্চ,
বুধবার ১৯৭১

কাল রাতে একদম ঘুম হয়নি। রাত আটটায় হঠাৎ কারফিউ। সারা দিন ধরে যত মিটিং আর মিটিং শেষে লাঠিসোটা-কাঠ-রড নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল, সন্ধের পরেও তার বিরাম ছিল না। আরো বেরিয়েছিলো মশাল মিছিল। রেডিওতে কারফিউয়ের ঘোষণা আমরা শুনিনি। তাই বুঝিনি কারফিউ ঘোষণার প্রতিবাদেই বেশি বেশি স্লোগান। ভেবেছি সারা দিনের জের ওটা। কিন্তু হঠাৎ সাইরেনের বিকট আওয়াজে চমকে উঠলাম। কী ব্যাপার? কী ব্যাপার? একে ওকে ফোন করে জানতে পারলাম ওটা কারফিউ জারির সাইরেন।

রাত এগারোটার দিকে মাইকেও কারফিউ জারির ঘোষণা দূর থেকে কানে এলো। শব্দ শুনে মনে হলো বলাকা নিউ মার্কেটের রাস্তায় এবং আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিক ইকবাল হলের সামনের রাস্তায়। তার পরপরই বহু কণ্ঠের স্লোগান আরো জোরে শোনা যেতে লাগলো। তার মানে কারফিউ অগ্রাহ্য করে মিছিল আর স্লোগান। কেমন যেন অস্থির লাগতে লাগলো। ভাবলাম, কয়েক জায়গায় ফোন করি অবস্থা জানার জন্যে গুলশানে রেবাকে, মদনমোহন বসাক রোডে মোনোয়ারাকে আর ইন্দিরা রোডে কামালকে।

রেবাকে বললো এখানে রাস্তায় কোনো মিছিল নেই। কিন্তু দূর থেকে স্লোগানের শব্দ পাচ্ছি, আমাদের পিছন দিকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া তো।

মনোয়ারা আমার ফোন পেয়ে কেঁদে ফেললো, কী যে হচ্ছে আপা। কেউ কারফিউ মানছে না, দলে দলে লোক রাস্তায় নেমে গেছে, ব্যারিকেড বানাচ্ছে, স্লোগান দিচ্ছে। পুলিশও গুলি করছে। গুলি খেয়ে লোকে আরো ক্ষেপে উঠছে, দ্বিগুণ জোরে স্লোগান দিচ্ছে। আমার ভাইটাও ওর মধ্যে আছে। জানি না বেঁচে আছে, না গুলি খেয়ে রাস্তায় পড়ে আছে। কী হবে আপা?

মনোয়ারার কান্না শুনে মনটা বিকল হয়ে গেল। আর কাউকে ফোন করতে ইচ্ছো করলো না। সারারাতই কানে এলো স্লোগানের সম্মিলিত গর্জন।

আজ সকালে খবর কাগজে গত রাতের মিছিল ও গুলির খবর বিস্তারিত পড়লাম। স্টেডিয়াম, নবাবপুর, টয়েনবী সার্কুলার রোড, ভজহরি সাহা

www.pathagar.com

স্ট্রিট, গ্রীন রোড, কাঁঠাল বাগান, কলাবাগান, নিউমার্কেট, ফার্মগেট—ঢাকার প্রায় সব এলাকাতেই কারফিউ ভঙ্গকারী জনতার উপর গুলি বর্ষণ করা হয়েছে। বহুলোক মারা গেছে, তার চেয়েও অনেক বেশি লোক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

কাগজের আরেকটা খবর দেখলাম বক্স করে দেওয়া হয়েছে।

১১০ নম্বর সামরিক আদেশ জারি।

'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা মোঃ ইয়াকুব খান গতরাতে এখানে ১১০ নম্বর সামরিক আদেশ বলে পত্রপাত্রিকাসমূহে পাকিস্তানের সংহতি বা সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী খবর, মতামত বা চিত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছেন।

আদেশ লঙ্ঘনে দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড।

খবরগুলো পড়ছি আর বুকের ভিতর কেমন যেন দম আটকানো ভাব হচ্ছে। ভাবলাম মনোয়ারাকে ফোন করি, খবর নেই, ওর ভাইটা কেমন আছে। বাড়ি ফিরেছে কি-না। কিন্তু ফোনের কাছে গিয়েও ফোন তুলতে পারলাম না।

রুমিকে নিয়ে হয়েছে আমার মহা উদ্বেগ। সারাদিন টো টো করে সারা শহর দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কখন যে কী হয়। বন্ধু বান্ধব নিয়ে বাসায় ফিস্ট লাগাতে বলছি, আগে সবসময় লুফে নিয়েছে এখন নাকি সময় নাই।

আজকেও প্রায় সারাদিন মিটিং মিছিল চলছে। আগের রাতে গুলিতে নিহত আটটি লাশ নিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতা মিছিল করে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা ঘুরছে, মিছিল শেষে শহীদ মিনারে লাশ রেখে সকলে সমস্বরে পূর্ব বাংলার অধিকার আদায়ের শপথ নিয়েছে।

বিকালে পল্টন ময়দানের জনসভাতেও এই লাশগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে বিশাল জনসমুদ্রে শহীদদের আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করার শপথ নিয়েছে। সভায় শেখ মুজিব সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। বলেছেন নির্বাচিত গণপ্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত বাঙালি জাতি এক পয়সাও ট্যাক্স খাজনা দিবে না। তিনি সরকারকে বলেছেন, সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে আর বাঙালি জনগণকে বলেছেন, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে অহিংস অসহযোগিতা চালিয়ে যেতে।

সন্ধ্যার পর রুমি বাড়ি ফিরলে তার মুখে এসব শুনলাম। আরো শুনলাম, এক নতুন পতাকার কথা। গতকালই নাকি বটতলায় ছাত্রদের জনসভায় এ পতাকা প্রথম দেখানো হয়েছিল। আজ পল্টনের জনসভায় শেখের উপস্থিতিতে প্রথমে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটা

www.pathagar.com

গাওয়া হলো। তারপর স্বাধীন বাংলার এই নতুন পতাকা উত্তোলন করা হলো।

আমি শিহরিত হয়ে বললাম, স্বাধীন বাংলার পতাকা? বলিস কী রে? কেমন দেখতে?

দাঁড়াও, একে দেখাই বলে একটা কাগজ ও কয়েকটা রঙিন পেনসিল এনে রুমি স্বাধীন বাংলার পতাকা আঁকতে বসলো। সবুজের উপর টকটকে লাল গোলাকার সূর্য, তার মধ্যে হলুদ রঙে পূর্ব বাংলার ম্যাপ।

আমি বললাম এ কদিন তো স্বাধিকারের কথাই শুনছি, নির্বাচিত জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথাই শুনছি, এর মধ্যে স্বাধীন বাংলার কথা কখন উঠলো?

তুমি কোনো খবর রাখ না আম্মা। স্বাধীন বাংলার দাবির কথা তো অনেক অনেক পুরনো ব্যাপার। ভেতরে ভেতরে বহুদিন থেকেই গুমরাচ্ছিল। গত বছর নভেম্বরের সাইক্লোনের পরে তা ফেটে পড়েছে। তোমার মনে নেই মাওলানা ভাসানী ১৮ই নভেম্বর দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে যেতে চাইলে তার জাহাজ আটকে দেওয়া হয়। সরকার অবশ্য পরে তাকে যেতে দেয় কিন্তু এই নিয়ে কী হৈ-চৈটা হয়, কাগজে পড়নি? তার পরেই তো ৪ই ডিসেম্বরের সেই যে মিটিং ন্যাপ, জাতীয় লীগ আরো কী কী দল যেন একত্রে মিটিং করল, ভাসানী সেখানেই পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার দাবি জানান। তারপর এখন আওয়ামী লীগের উগ্র জাতীয়তাবাদী সেকশনের কাছ থেকে স্বাধীন বাংলার দাবি উঠেছে। চার খলিফা খুব চাপ দিচ্ছে শেখকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার জন্য।

জান না বুঝি, আ.স. ম. আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ, আব্দুল কুদ্দুস মাখন আর নূরে আলম সিদ্দিকী—এই চার জননেতাকে আমরা সবাই চার খলিফা বলে ডাকি। শাহজাহান সিরাজই তো আজ পল্টন জনসভায় পতাকাটা তুলেছে।

শেখ কী বললেন?

কিছুই বললেন না, তবে খুব যে খুশিও হননি, মুখ দেখে বুঝা গেল।

তাতো হবেনই না। এই মুহূর্তে স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়াটা খুব রিস্কি ব্যাপার না?

রিস্কি নিশ্চয়। কিন্তু আম্মা ঘটনার একটা নিজস্ব গতি আছে না। জল প্রপাতের মতো। উঁচু পাহাড় থেকে যখন গড়িয়ে পড়ে তখন তাকে রুখতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই। আমাদের দেশের জনতা এখন ঐ জলপ্রপাতের মতো একটা অনিবার্য পরিণতির দিকে অত্যন্ত তীব্র বেগে ছুটে যাচ্ছে। একে আর বোধ হয় রোখা যাবে না।

www.pathagar.com

৭ই মার্চ

রবিবার ১৯৭১

আজ বিকেলে রমনা রেসের মাঠে গণজমায়েত। গত কদিন থেকে শহরের সবখানে সবার মধ্যে এই জনসভা নিয়ে তুমুল জল্পনা-কল্পনা, বাক-বিতন্ডা, তর্ক-বিতর্ক। সবাই উত্তেজনায়, আগ্রহে, উৎকণ্ঠায়, আশঙ্কায় টগবগ করছে। আমি যদিও মিটিংয়ে যাব না, বাসায় বসে বক্তৃতার রিলে শুনব, তবু আমাকেও এই উত্তেজনার জ্বরে ধরেছে।

এর মধ্যে সুবহান আমাকে জ্বালিয়ে মারল। আজ তাড়াতাড়ি রান্না সারতে বলেছিলাম। শরীফ বলেছে বারোটার মধ্যে খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নেবে। ঠিক দেড়টাতে রওনা দেবে, নইলে কাছাকাছি দাঁড়ানোরও জায়গা পাবে না। আর সুবহান হতচ্ছাড়াটা এগারোটার সময় গোসত পুড়িয়ে ফেলল। বারেককে দিয়েছিলাম রুমি জামিদের শার্ট ইস্ত্রি করতে। সুবহান চুলায় গোসত রেখে বারেকের সঙ্গে ইস্ত্রি করাতে মেতেছে। তিনিও আজ শেখের বক্তৃতা শুনতে যাবেন। তাই তার নিজের প্যান্ট-শার্ট ইস্ত্রি তদারকিতে যখন মগ্ন তখন গোসত গেছে পুড়ে। কী যে করি ওকে নিয়ে। তাড়াতাড়ি ডিমের অমলেট করে ডাল ভাজিসহ ভাত দিলাম শরীফদের।

এতবড় কাজ করে, এতো বকা খেয়েও সুবহানের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। রান্না ঘরে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে প্যান্ট শার্ট পরে তিনি শরীফদের সঙ্গে চললেন শেখের বক্তৃতা শুনতে। আজ বারেকও গেছে ওদের সঙ্গে। এর আগে কোনো মিটিংয়ে যেতে দেয়নি ওকে। আজকে না দিলে বড় অন্যায় হবে।

কিটির ঘরে গিয়ে ওর বারো ব্যান্ডের দামি রেডিওটা চেয়ে নিয়ে উপরে গেলাম। ওকেও আসতে বললাম আমার ঘরে। বাবা দুপুরের খাওয়ার পর শুয়ে ঘুমোচ্ছেন।

আমি রেডিওটা নিয়ে আয়েশ করে বিছানায় শুলাম। একটু পরে কিটিও এল। রেডিও অন করে রেখেই দুজনে শুয়ে শুয়ে গল্প করতে লাগলাম।

রেডিওতে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটা শোনা গেল। আমরা কথা বন্ধ করে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। ওমা তার পর আর শব্দ নেই। কী ব্যাপার?

শব্দ নেই তো নেই-ই। কারেন্ট গেল? বাতির সুইচ টিপে দেখলাম কারেন্ট আছে। রেডিওটা খারাপ হলো? নব ঘুড়িয়ে দেখলাম অন্য স্টেশন ধরছে। তাহলে?

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম চল ছাদে যাই তো।

www.pathagar.com

দুজনে ছাদে গেলাম। পূর্বদিকে সোজাসুজি মাপলে মাত্র আধ মাইল দূরে রেসের ময়দান। নানা রকম স্লোগানের অস্পষ্ট আওয়াজ আসছে। আকাশে চক্কর দিচ্ছে হেলিকপ্টার। হেলিকপ্টার কেন? কী ব্যাপার?

ব্যাপার সব জানা গেল শরীফরা মিটিং থেকে ফেরার পর।

কলিং বেলের শব্দ শুনে ছুটে গিয়ে দরজা খুলতেই রুমি দুহাত তুলে নাটকীয় ভঙ্গিতে "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো। দেখি ফখরুদ্দিনও এসেছেন। ফখরুদ্দিন সংক্ষেপে ফকির শরীফের স্কুল জীবনের বন্ধু। তার পেশা ব্যবসা আর নেশা রাজনীতি, যদিও কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন তিনি। তবে রাজনৈতিক অঙ্গনের খবরাখবরে তার চেয়ে ওয়াকিবহাল আমাদের জানার মধ্যে আর নেই।

সোফায় ধুপ করে বসে পড়ে ফকির বললেন, ভাবী চা খাওয়ান। এক সঙ্গে তিন কাপ গলা শুকিয়ে কাঠ। চেহারাও তো শুকিয়ে কাঠি। কী করে বেড়ান আজকাল? খান না নাকি? শরীফ মুচকি হেসে বললো, নেতাদের লেজ ধরে দৌড়াদৌড়ির চোটে ওর নাওয়া-খাওয়ার ফুসরত নাই। সুযোগ পেয়েই শরীফ ফকিরের পেছনে লাগে। আমি সুবহানকে চায়ের হুকুম দিয়ে সোফায় বসলাম। ওসব লেগ পুলিং এখন রাখ। মিটিংয়ের কথা বল। রেডিও বন্ধ হয়ে রয়েছে কেন? আকাশে হেলিকপ্টার দেখলাম যেন। রুমি বলল হেলিকপ্টার তো পয়লা তারিখের পল্টন জনসভাতেও ছিল। ওরা বোধ হয় গার্ড অব অনার দেওয়ার রেওয়াজ করেছে।

সবাই হেসে উঠল। কিটি রেডিও হাতে গুটি গুটি পায়ে এসে দাঁড়াল। মৃদু কণ্ঠে বলল, রেডিও এখনো চুপ।

আমি বললাম কিটি এখানে এসে বস। আজ তোমার সোনার বাংলা বোঝার পরীক্ষা নেব। এখানে বসে আমাদের বাংলা কথাবার্তা শোন। তারপর পুরোটা বলতে হবে। রেডিওটা খোলাই থাক।

কিটি হেসে সহজ হলো। সোফায় এসে বসল। আমরা বাঁচলাম-এখন কলকল করে মাতৃভাষায় আলাপ না করলে প্রাণে শান্তি হবে না।

রেসকোর্স মাঠের জনসভায় লোক হয়েছিল প্রায় তিরিশ লাখের মতো। কত দূর দূরান্তর থেকে যে লোক এসেছিল মিছিল করে, লাঠি আর রড ঘাড়ে করে, তার আর লেখা জোখা নিয়ে। টঙ্গী, জয়দেবপুর, ডেমরা-এসব জায়গা থেকে তো বটেই, চব্বিশ ঘণ্টার পায়ে হাঁটার পথ পেরিয়ে ঘোড়াশাল থেকেও বিরাট মিছিল এসেছিল গামছায় চিড়ে গুড় বেঁধে। অন্ধ ছেলেদের মিটিংয়ে যাওয়ার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। বহু মহিলা, ছাত্রী মিছিল করে মাঠে গিয়েছিল শেখের বক্তৃতা শুনতে।

www.pathagar.com

কিন্তু শেখ নিরাশ করেছে সবাইকে। রুমির একথায় সবচেয়ে প্রতিবাদ করে উঠলেন ফকির, তোমার মাথা গরম, চ্যাংড়া ছেলেরা কী যে বল না— ভেবেচিন্তে শেখ যা করেছেন তা ঠিক করেছেন।

সেটি পুরোনো বাক-বিতন্ডা যা গত কয়েকদিন ধরে সবর্ত্রই শুনছি। একদল চায় শেখ স্বাধীনতার ঘোষণা দিন, আরেক দল বলছে তাহলে সেটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হবে।

রুমি তার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গলাতেই দৃঢ়তা এনে প্রতিবাদ করল। আপনারা দেওয়ালের লিখন পড়তে অপারগ। দেখেননি আজ মিটিংয়ে কত লাখ লোক স্বাধীন বাংলার পতাকা হাতে নিয়ে এসেছিল? জনগণ এখন স্বাধীনতাই চায়। এটা তাদের প্রাণের কথা। নইলে মাত্র এই ছয় দিনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সবাই সবখানে স্বাধীন বাংলার ঐ রকম ম্যাপ লাগানো পতাকা সেলাই করার মতো একটা জটিল কাজ, অন্যসব কাজ ফেলে, সেটা আবার বাতাসে নাড়াতে নাড়াতে প্রকাশ্য দিবালোকে মিছিল করে যায়?

তর্কের গন্ধ পেলে তর্কবাগীশ ফকির চাঙ্গা, তিনি বললেন তুমিও দেখছি চার খলিফার দলের।

রুমি বলল, আমি কোন দলভুক্ত নই, কোনো রাজনৈতিক দলের শ্লোগান বয়ে নিয়ে বেড়াই না। কিন্তু আমি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন, মান-অপমান জ্ঞানসম্পন্ন একজন সচেতন মানুষ। আমার মনে হচ্ছে শেখ আজ ঢাকা দখল করার মস্ত সুযোগ হারালেন।

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, এই সুদূরপ্রসারী তর্ক শুরু করার আগে আমি তোমাদের কাছে শুনতে চাই ছোট্ট একটা খবর। শেখের বক্তৃতা রিলে করা হবে বলে সারা দিন রেডিওতে অ্যানাউন্স করেও শেষ পর্যন্ত রিলে করা হলো না কেন? কেনই বা রেডিও একদম ডেডস্টপ? এই শুনার পর আমি রান্না ঘরে চলে যাব। তখন তোমরা মনের সুখে সারারাত কচকচ করো।

শেখের বক্তৃতা রিলে করার জন্যে বেতার কর্মীরা তো তৈরিই ছিলো। শেষ মুহূর্তে মর্শাল ল অথরিটি বক্তৃতা রিলে করতে দিল না। ব্যস অমনি রেডিও স্টেশনের সমস্ত কর্মীরা হাত গুটিয়ে বসল। শেখের বক্তৃতা রিলে করতে না দিলে অন্য কোনো প্রোগ্রামই যাবে না। তাই রেডিও এরকম চুপ।

জামি এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি, এখন হঠাৎ বলে উঠল, জান মা আজ বিকেলের প্লেনে টিক্কা খান ঢাকায় এসেছেন গভর্নর হিসেবে।

এক সপ্তাহে দুই বার গভর্নর বদল। এক তারিখে ভাইস এডমিরাল এস এম আহসানকে বদলে লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে দেওয়া হয়েছিল, এখন আবার ছ'দিনের মাথায় তাকে সরিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে আনা হল। কী এর আলামত?

আজ রাতে রেডিও আর গলাই খুলল না।

www.pathagar.com

২৫ শে মার্চ,
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

২৩শে মার্চের উজ্জ্বল প্রতিরোধ দিবসের পর কী যেন এক কালোছায়া সবাইকে ঘিরে ধরেছে। চারদিক থেকে খালি নৈরাশ্যজনক খবর শোনা যাচ্ছে। ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টোর বৈঠক যেন সমাধানের কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছে না। শেখ মুজিব প্রতিদিন প্রেসিডেন্ট ভবনে যাচ্ছেন আলোচনা করতে, বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের বলছেন আলোচনা এগোচ্ছে; ওদিকে আন্দোলনকারী জঙ্গী জনতাকে বলছেন দাবি আদায়ের জন্য আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যান। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তলুন।

বেশ কিছুদিন থেকে মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে প্রতিদিন নাকি প্লেনে করে সাদা পোশাকে প্রচুর সৈন্য এসে নামছে বিমানবন্দরে। বিশ্বাস হতে চায় না কথাটা, তবু বুক কেঁপে উঠে। ওদিকে চট্টগ্রাম থেকে দু'তিনজন বন্ধুর টেলিফোনে জানা গেছে—চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ এসে ভিড়ছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। সে অস্ত্র চট্টগ্রামের বীর বাঙালিরা খালাস করতে দিবে না বলে মরণ-পণ করে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছে। ওদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য আর্মি ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের ওপর।

রুমির মুখে দু'দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথার চুল খামছে ধরে রুমি বলল, আম্মা বুঝতে পারছ না মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এটা ওদের সময় নেবার অজুহাত মাত্র। ওরা আমাদের স্বাধীনতা দেবে না। স্বাধীনতা আমাদের ছিনিয়ে নিতে হবে সশস্ত্র সংগ্রাম করে।

আমি শিউরে উঠলাম, বলিস কিরে? পাকিস্তান আর্মির কাছে আছে লেটেস্ট মডেলের সব অস্ত্রশস্ত্র। তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করবি কী দিয়ে?

রুমি উত্তেজিত গলায় বলল, একজ্যাক্টলি, সেই প্রশ্ন আমারও। সাদা গাড়িতে কালো পতাকা উড়িয়ে শেখ রোজ প্রেসিডেন্ট হাউজে যাচ্ছেন আর আসছেন, আলোচনার কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না। ওদিকে প্লেনে করে রোজ সাদা পোশাকে হাজার হাজার সৈন্য এসে নামছে, চট্টগ্রামে অস্ত্রভর্তি জাহাজ ভিড়ছে। আর এদিকে ঢাকার রাস্তায় লাঠি-হাতে বীর বাঙালিরা ধেই ধেই করে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে সালাম দিয়ে হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরে পেট পুরে মাছ ভাত খেয়ে ঘুম দিচ্ছে। পল্টন ময়দানে ডামি বন্দুক ঘাড়ে কুচকাওয়াচ করছে। আমরা কী এখনো রূপকথার নগরে বাস করছি নাকি? ছেলে মানসিরও একটা সীমা থাকা দরকার।

তাহলে এখন উপায়?

উপায় বোধ হয় আর নেই আম্মা।

ভয় আর আতঙ্কের একটা হিম বাতাস আমাকে অবশ করে দেয় যেন, না, না, ওরকম করে বলিস না। তুই শেখের রাজনীতি সমর্থন করিস না, তাই

www.pathagar.com

একথা বলছিস। তোরা হলি জঙ্গী বাঙালি খালি মার মার কাট কাট। শেখ ঠিক পথেই আন্দোলনকে চালাচ্ছেন। ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হলেও এভাবে অহিংস, অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে জনগণ তাদের দাবি ঠিকই আদায় করে নেবে?

আম্মা তুমি কোন আহাম্মকের স্বর্গে বসে আছ? শুধু কয়েকটা বিষয় তলিয়ে দেখ—পূর্ব পাকিস্তানে যা যা ঘটছে, সবই পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে। স্বাভাবিক হিসেবে এগুলো সবই বিষম রাষ্ট্রদ্রোহিতা। দেশের সর্বময় কর্তা প্রেসিডেন্ট খোদ হাজির, অথচ দেশ চলছে শেখের কথায়। লোকে অফিস আদালত ব্যাংক সব চালাচ্ছে শেখের সময়ে। তারপর দেখ পাকিস্তান সরকারের হেনস্তা। টিক্কা খানকে কোনো বিচারপতি শপথ গ্রহণ করাতে রাজি হল না, বেচারা গভর্নর হতে পারলনা। শুধু মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর হয়ে কাজ চালাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ঢাকায় এসে নামল আর তার বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ। সেনাবাহিনীর জন্য কোনো বাঙালি খাবার জিনিস বেচছে না। ওরা কতদিন ডাল-রুটি খেয়ে থেকেছে। তারপর প্লেনে করে পশ্চিম পাকিস্তান হতে খাবার আনতে হয়েছে। এতসব কাণ্ডের পরও ইয়াহিয়া সরকার একদম মুখ বুজে চুপ করে আছে। কেন বুঝতে পারছ না? ওরা শুধু সময় নিচ্ছে। ওরা আলোচনার নাম করে আমাদের ভুলিয়ে রাখছে। শেখ বড্ডো দেরি করে ফেলেছেন। এপথে এভাবে আমরা বাঁচতে পারব না।

আমি রাগ করে বললাম, দাড়ি কামিয়ে সাবান মেখে ঠাণ্ডা পানিতে ভালো করে গোসল কর বাপু, মাথা বড্ড বেশি গরম হয়ে গেছে।

রুমি নীরবে উঠে নিজের ঘরে চলে গেল। আমি কেমন যেন চুপসে গেলাম। নিজের মনেও যেন আর জোর পাচ্ছি না।

আজ আবার রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী দম্পতি আতিক ও বুলুর বাসায় রাতের খাবার দাওয়াত আছে। এরকম অবস্থায় দাওয়াত খেতে যেতে ইচ্ছে করে না। আবার ঘরে বসে থাকলেও ফাপর লাগে। শরীফের মিটিং ছিল ঢাকা ক্লাবে। অতএব আমি একাই গেলাম আতিকের বাসায়। সেখানে দেখা হলো এনায়েতউল্লাহ খান ও তার স্ত্রী লীনার সঙ্গে। লীনার ছোট ভাই জিলুর রহমান খান ও তার আমেরিকান বউ মার্গারেটের সঙ্গে। আরো এসেছে আতিকের বন্ধু হালিম ও তার স্ত্রী মণি, আতিকের ভায়রা ভাই ফাত্তাহ ও তার স্ত্রী। সকলের মুখে একই কথা : কী হবে? কী হবে?

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নাকি কাউকে না জানিয়ে লুকিয়ে প্লেনে চড়ে পশ্চিম পাকিস্তান চলে গেছে? রাস্তায় নাকি ইতিমধ্যেই আর্মি নেমে গেছে? আমি বুঝতে পারছি না আর্মি কেন নামবে?

www.pathagar.com

সাড়ে নয়টার সময় মাসুমা ফিরল টিভি অফিস থেকে। কিছুদিন আগে বড়ভাই রফিকুল ইসলামের বাসা ছেড়ে এখন মেজভাই আতিকুল ইসলামের বাসায় থাকছে। সে এল ঝরে পড়া পাখির মতো বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে। সবার মধ্যে যে আশঙ্কা তার মধ্যেও তাই। বরং টিভি স্টেশনে সে আমাদের চেয়ে বেশ কিছু শুনেছে। কিন্তু মাসুমা আমাদের সঙ্গে বসল না, বলল খুব বেশি টায়ার্ড আমি, নিজের ঘরে যাই। অনেক বলা সত্ত্বেও সে খেল না আমাদের সঙ্গে।

আমাদেরও খিদে ছিল না। কোনোমতে খাওয়া সারলাম সবাই। সাড়ে দশটার দিকে শরীফ ফোন করলো, এখনো দেরি করছো কেন? শহরের অবস্থা ভাল না। বহু জায়গায় জনতা নতুন করে ব্যারিকেড দিচ্ছে। ইয়াহিয়া ঢাকা ছেড়ে চলে গেছে। অনেক রাস্তায় আর্মির গাড়ি দেখা যাচ্ছে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এসো।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ভীষণ শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চমকে উঠে বসলাম। রুমি-জামি ছুটে এল এ ঘরে। কী ব্যাপার? দু'তিন রকমের শব্দ—ভারি বোমার বুম বুম আওয়াজ, মেশিনগানের ঠা-ঠা-ঠা-ঠা আওয়াজ, চি-ই-ই-ই করে আরেকটা শব্দ। আকাশে কী যেন জ্বলে জ্বলে উঠছে, তার আলোয় ঘরের ভেতর পর্যন্ত আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছে। সবাই ছুটলাম ছাদে। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে মাঠ পেরিয়ে ইকবাল হল, মুহসিন হল আরো কয়েকটা হল, ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার্সের কয়েকটা বিল্ডিং। বেশির ভাগ আওয়াজ সেই দিক থেকে আসছে, সেই সঙ্গে বহু কণ্ঠের আর্তনাদ চিৎকার। বেশিক্ষণ ছাদে দাঁড়ানো গেল না। আগুনের ফুলকির মতো কী যেন চি-ই-ই-ই-কার শব্দের সঙ্গে এদিক পানে উড়ে আসছে। রুমি হঠাৎ লাফ দিয়ে কালো আর স্বাধীন বাংলা পতাকা দুটো নামিয়ে ফেলল।

হঠাৎ মনে পড়ল একতলায় বারেক কাসেম ওরা আছে। হুড় হুড় করে সবাই নিচে নেমে গেলাম। রান্না ঘরের ভেতর দিয়ে উঠানের দিকের দরজা খুলতেই আমাদের অ্যালসেসিয়ান কুকুর মিকি তীর বেগে ঘরে ঢুকে আমাদের সবার পায়ে লুটোপুটি খেতে খেতে করুণস্বরে আর্তনাদ করতে লাগল। উঠানের দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকলাম, বারেক-কাসেম। ওদের দরজা খুলে বারেক, কাসেম কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে ঘরে ঢুকলো। আমি বললাম, তোমরা তোমাদের বিছানা নিয়ে এ ঘরে চলে এসো।

মিকিকে কিছুতেই আর ঘর থেকে উঠানো নামানো গেল না। এত গোলাগুলির শব্দ আর ট্রেসার হাউইয়ের নানা রঙের আলোর ঝলকানিতে সে দিশেহারা হয়ে গেছে। রুমি তার মাথায় ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, ভয় নেই মিকি, ভয় নেই। তুই আমাদের সঙ্গে উপরে থাকবি। তাকে

www.pathagar.com

উপরেও নেওয়া গেল না। কী এক মরণ ভয়ে ভীত হয়ে সে খালি কোণা খুঁজছে। শেষে সিঁড়ির নিচের ঘুপচি কোণটাতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইল।
বসার ঘরে ফোন তুলে দেখি ফোন ডেড। উপরে উঠে গেলাম। বাবার গলা শুনলাম। রুমি গিয়ে বাবার হাত ধরে মৃদুস্বরে তাকে কী কী যেন বলতে লাগল।
বাকি রাত আর ঘুম এলো না। আবার ছাদে গেলাম। দূরে দূরে আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন দিক থেকে গোলাগুলি আর মেশিনগানের শব্দ আসছে, ট্রেসার হাউই আকাশে রংবাজি করে চলেছে। দূর থেকে চিৎকার ভেসে আসছে। উত্তরে দক্ষিণে, পূর্বে পশ্চিমে সবদিকেই দূরে আগুনের স্তম্ভ ক্রমেই স্পষ্ট ও আকাশচুম্বি হয়ে উঠছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। রুমি-জামি নীরবে থমথমে মুখে সুতলির বাঁধন খুলে প্লাস্টিক ব্যাগ একে একে উপুড় করলো কমোডে। একটু করে ফ্লাশ করে, খানিক অপেক্ষা করে, আবার ঢালে, আবার ফ্লাশ করে। এক সঙ্গে সব মালমশলা ঢাললে কমোডের নল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। জামি বাসন মাজা পাউডার দিয়ে তিন চার বার করে হামানদিস্তা দুটো মাজল আর ধুল। একবার ধুয়ে শুকে দেখে, আবার মাজে, আবার ধোয়।
এ কাজ সেরে রুমি মার্কস, এঙ্গেলসের বই, মাও সে-তুংয়ের মিলিটারি রচনাবলি, সব একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরল। আমরা চিন্তা করতে লাগলাম, কোথায় বইগুলো লুকানো যায়। মাটিতে পুঁততে চাইলে বইগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। শেষে মনে পড়ল বারেকদের ঘরের পিছনে বাউন্ডারি ওয়ালের এক জায়গায় একটা কুঠুরির মতো আছে। প্রতিবেশী হাশেম সাহেবের বাউন্ডারী ওয়ালের দরুন এই কুঠুরি সৃষ্টি হয়েছে। এখানে বইয়ের প্যাকেটটা ফেলে রাখলে লুকোনোও হবে, নষ্টও হবে না। ভোরের আলো অল্প একটু ফুটতেই রুমি সাবধানে গুড়ি মেরে ওখানে গিয়ে বইয়ের প্যাকেটটা রেখে দিল। তার ওপর ফেলল কয়েকটা শুকনো নারিকেলের পাতা।

২৬শে মার্চ
শুক্রবার ১৯৭১
ছ'টার দিকে হঠাৎ ফোন এল কাঁপা কাঁপা অস্পষ্ট গলায় ডাক, আপা আপা। চমকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি বাগানের একটি জবা গাছের নিচে কুকড়ি মেরে বসে আছেন কামাল আতাউর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অনার্স পরীক্ষার্থী, মুহসিন হলে থাকে। ছুটে নিচে গেলাম। দরজা খুলে উদভ্রান্ত, প্রায় অচেতন কামালকে তুলে ধরে ঘরে নিয়ে এল রুমি।

www.pathagar.com

জামিও সারারাত একটি বাথরুমে আরো দশবারোটো ছেলের সঙ্গে লুকিয়ে ছিল। ট্রেসার হাউইয়ের দরুন রাতে বেরোতে সাহস পায়নি। এখন সকালের আলো ফুটতে ট্রেসার হাউই বন্ধ হয়েছে। ওরা বাথরুম থেকে বেরিয়ে মাঠ, খানা-খন্দল, রেললাইন পুরো এলাকাটা চার হাতপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে এসেছে।

কামালকে সুস্থ করে রেডিও খুললাম। সূরা বাকারার পর শুধু একটি বাজনাই বারেবারে বাজছে। আমার প্রিয় একটি গান–কোকিল ডাকা, পলাশ ঢাকা আমার এদেশ ভাইরে—এই গানের সুরে তৈরি যন্ত্রসঙ্গীত। সাতটার সময় পাশের ডাঃ এ. কে খানের বাড়ি গেলাম ফোন করতে। ওদের ফোনও ডেড। ক্রমে ক্রমে আমাদের রাস্তার আরো সব বাড়ির লোকজন উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। সবারই মুখে আতঙ্ক। সবাই সারারাত জেগেছে। কেউ কিছু বুঝতে পারছি না। কী হচ্ছে? সব বাড়ির ফোনই ডেড।

বাড়ি চলে এসে খাবার টেবিলে বসে রইলাম, রেডিও সামনে রেখে। জামিকে বললাম, বারেককে সঙ্গে নিয়ে দাদাকে উঠাও, মুখ ধোয়াও, নাস্তা খাওয়াও।

কাসেম যন্ত্রচালিতের মতো টেবিলে নাস্তা দিয়ে গেল। নাশতা ফেলে সবাই চায়ের কাপ টেনে নিলাম।

সাড়ে ন'টার সময় হঠাৎ যন্ত্রসঙ্গীত বন্ধ হল। শোনা গেল একটা রুক্ষ অবাঙালি কণ্ঠস্বর। প্রথমে উর্দু এবং পরে ইংরেজিতে বলল। পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকবে। কারফিউ ভঙ্গ করে কেউ বাইরে বেরোলে কী শাস্তি, তাও বলল। আর বলল, মার্শাল ল জারি করা হয়েছে। তার নিয়ম কানুনগুলো এক এক করে বলে যেতে লাগল। বেতার ঘোষকের উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি শুনে মনে হল লোকটা একটা সেপাই-টেপাই কিছু হবে। সামরিক সরকার আর কাউকে হাতের কাছে না পেয়ে ওকে দিয়ে ঘোষণাগুলো করাচ্ছে।

অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ। যা তাণ্ডব হচ্ছে চারদিকে, কারফিউ না দিলেও বাইরে বের হয় কার সাধ্যি। গুলাগুলির শব্দ থামেই না। মাঝে মাঝে কমে শুধু। আগুনের স্তম্ভ দেখতে এখন আর ছাদে উঠতে হয় না। দুতলার জানালা দিয়েই বেশ দেখা যায়। কালো ধোয়ায় রোদ্রকরোজ্জ্বল নীল আকাশের অনেকখানিই আচ্ছন্ন।

মিকির কান্নায় অস্থির হয়ে উঠেছিল সবাই। ওর অ্যালসেসিয়ান চরিত্রই বদলে গেছে যেন। অবিশ্রান্ত গুলাগুলির শব্দে এই জাতের সাহসী কুকুর যে একরকম কাহিল ও উদভ্রান্ত হয়ে পড়বে কে ভেবেছিল। ওকে কিছু

www.pathagar.com

খাওয়ানো যাচ্ছে না। আমরা সবাই পালা করে ওকে কাছে টেনে ওর গলা ধরে সুস্থির রাখার চেষ্টা করছি, কিন্তু কোনো ফল হচ্ছে না।

বাবাকে নিয়েও হয়েছে মুশকিল। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী কেন, কী দোষে নিজের দেশের লোকজনকে মারছে, তা ওকে বুঝাতে গিয়ে আমাদের সবার মুখ দিয়ে ফেনা উঠে গেল। আমার ভয় হচ্ছে ওর আবার ব্লাড প্রেসার না বেড়ে যায়। টেলিফোন বিকল, রেডিও পঙ্গু, বাইরে কারফিউ গুলাগুলির শব্দের চোটে প্রাণ অস্থির। বাইরে কী হচ্ছে কিছুই জানবার উপায় নেই। এ ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী স্কুপ সংবাদদাতা কামাল আতাউর রহমান। সকাল থেকে আমার বারবার প্রশ্নে একই কথা বলতে বলতে কামালও যেন হাপিয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে।

আচ্ছা কামাল রাত বারোটার সময় তুমি কী করছিলে?

আমি? আমি একটি প্রবন্ধ লিখছিলাম। বাংলা সাহিত্যে দেশ প্রেম। ২৭ তারিখে রেডিও প্রগ্রামে পড়বার জন্য।

কখন গুলাগুলির শব্দ শুনলে?

ঐ বারোটার দিকেই। হয়তো দু'চার মিনিট পরে। আমার এক বন্ধু এসে বলল, তুই এখনো হলে রয়েছিস? জানিস না শহরের অবস্থা ভয়ানক খারাপ। আর্মি আসছে ক্যাম্পাস অ্যাটাক করতে। আমি বাড়ি চললাম। তুইও বাইরে যা। কিন্তু আমরা কেউই আর বেরোবার চান্স পেলাম না। তখুনই কানে এল ভয়ানক গুলাগুলির শব্দ। একটু পরেই চারদিক আলো হয়ে উঠতে লাগল। একবার করে আলো জ্বলে আর গোলাগুলি ছোটে। আমার ঘর ছিল পাঁচতলায়। তাড়াতাড়ি একতলায় নেমে এলাম। হাজী মুহসিন হলের দক্ষিণে ইকবাল হল—তার ও পাশে এসএম হল। মনে হল ভারি ভারি কামানের গোলা দিয়ে মিলিটারিরা ইকবাল হল উড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদের হলের দিকে গুলি ছোটে আসছিল।

তোমাদের হল আক্রমণ করেনি?

না, আমরা প্রতি মুহূর্তে ভয় করছিলাম, এই বুঝি হাজী মুহসিন হলেও এল। কিন্তু ওরা আসেনি।

আর কোথায় কোথায় ওরা অ্যাটাক করেছে বলে মনে হয়?

ঠিক বলতে পারবো না। মনে হয় এসএম হল, জগন্নাথ হল, শহীদ মিনার। ঐ দিক থেকেই শব্দ বেশি পাওয়া গেছে।

তোমার কী মনে হয় ইকবাল হল, এসএম হল সব একেবারে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। সব ছেলেদের মেরে ফেলেছে?

www.pathagar.com

কী করে বলবো? আমরা তো একতলায় বাথরুমে লুকিয়ে ছিলাম। শব্দ শুনে মনে হয়েছে ভারি ভারি গোলা। মুহসিন হলের মাথার উপর দিয়েও গুলি ছুটে আসছিল। জানালার কাচ ভাঙ্গার শব্দ পেয়েছি সারারাতই।

এক পর্যায়ে কামাল বাথরুমে গেলে রুমি আমাকে বলল, ওকে আর জিজ্ঞাসা করো না তো আম্মা। দেখছো না ওর কষ্ট হচ্ছে।

তাতো দেখছি। কিন্তু কী যে হচ্ছে চারিদিকে তাই বুঝবার জন্য।

বুঝবার আর কী আছে আম্মা। যা ঘটবার কথা ছিল তাই তো ঘটছে।

চুপ করে রুমির দিকে তাকিয়ে রইলাম। রুমি চোখ ফিরিয়ে নিল। কাল রাত থেকে ও বিশেষ কথাবার্তা বলছে না। থম ধরে আছে। আমি ভাবছি : রুমির কথাই ঠিক হলো।

রুমি নিশ্চয় ভাবছে কেমন জব্দ আম্মা? আহাম্মকের স্বর্গ থেকে ছিটকে পড়েছ তো।

কাহতক রুমে বসে থাকা যায়। একসময় উঠে সদর দরজা খুলে গাড়ি বারান্দায় গেলাম। আমাদের বাসার সামনের এই গলিটা কানা। এলিফ্যান্ট রোড থেকে নেমে এসে আমাদের বাসা পেরিয়েই বন্ধ হয়ে গেছে। ওই বন্ধ জায়গাটার উপরে ডাঃ এ. কে খানের বাড়ি। বন্ধ গলি হওয়ার মস্ত সুবিধে-এখানে বাইরের লোকজনের চলাচল বা ভিড় নেই। এ রাস্তার বাড়িগুলোর বাসিন্দারা-আমরা অনেক সময় গলির ওপর দাঁড়িয়ে গল্প করি। গলিটা যেন আমাদের সকলের এজমালি উঠান। ১৯৫৯ সালে এখানে বাড়ি করে উঠে আসার পর থেকে এদেশে যতবার কারফিউ পড়েছে আমরা বাড়ির সামনের এই গলিতে দাঁড়িয়ে গল্প গুজব করে কাটিয়েছি। আজ কিন্তু গাড়ি বারান্দা পেরিয়ে গলিতে পা রাখার সাহস হল না। গোলাগুলির শব্দে এখনো আকাশ ফাটছে। মাঝে কুকুরের শব্দ কানে ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে যেন মানুষেরও চিৎকার। খুব অস্পষ্ট। নাকি আমার ভুল? এতো বিরামহীন গোলাগুলির পরও কোনো মানুষ কী বেঁচে আছে চিৎকার করার জন্য। আশ্চর্যের ব্যাপার, একটা কাক, চিল বা কোনো পাখির শব্দ নেই।

বাউন্ডারী ওয়ালের এপাশে শরীর রেখে শুধু মুখটা বাড়ালাম গেটের বাইরে। বাদিকে তাকালাম মেইন রোডের পানে। জনশূন্য রাস্তা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে হয়তো সৈন্যভর্তি ট্রাক বা জিপ চলে যেতে দেখব। কিন্তু দরকার নেই তা আমাদের দেখে। আমার মুখোমুখি বাসাটা হোসেন সাহেবের। উনি খোলা দরজার ঠিক ভেতরেই চেয়ারে একবার বসছেন, আবার উঠে বারান্দায় আসছেন, আবার তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে যাচ্ছেন। বা পাশে ডাঃ রশিদের বাড়ি। উনিও অস্থিরভাবে ঘর-বারান্দা করছেন এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। ফিরে ঘুরে ঢোকার মুখে গাড়ির দিকে নজর পড়তেই আঁতকে

www.pathagar.com

উঠলাম। কাচ জুড়ে জ্বল জ্বল করছে সেই স্টিকার- একেকটি বাংলা অক্ষর এক একটি বাঙালির জীবন। দ্রুত ঘরে ঢুকে রুমিকে ডাকলাম, রুমি, রুমি শিগগির গাড়ির স্টিকার উঠিয়ে ফেল।

ঠিক সন্ধ্যার মুখে কারেন্ট চলে গেল। বাঃ বেশ। এবার ষোলকলা পূর্ণ হল। গুলাগুলির শব্দ একটু কমেছে বলে মনে হল। মিকিও যেন একটু ইতস্ত হয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে উঠানের একপাশের ঢাকা জায়গায় তার নিজস্ব জলচৌকিটায় গিয়ে বসেছে। সামান্য কিছু খেয়েছেও।

আমি চার-পাঁচটা মোমবাতি বের করে একতলা দুতলায় তিন চার জায়গায় বসিয়ে দিলাম। আজ সারাদিন বারেক, কাসেম আমাদের চারপাশেই ঘোরাঘুরি করেছে। সন্ধের সময় বারেক-কাসেমকে বললাম, তোরা এখনি তোদের বিছানা পত্র এনে গেস্ট রুমে রাখ। অন্ধকারে উঠুনে বেরিয়ে কাজ নেই। ওরা কৃতজ্ঞ মুখে দৌড়াদৌড়ি করে বিছানাপত্র এনে রেখে আমাদের কাছাকাছি মাটিতে এসে বসল। মনে হল আমরা সবাই নূহের নৌকায় বসে আছি।

বাড়িতে একটা ভাল রেডিও নেই। এবার ২০ ফেব্রুয়ারির শেষ রাতে আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই বাইরে ছিলাম। সেই ফাঁকে বাসায় চোর ঢুকে অনেক জিনিসের সঙ্গে আমাদের ভাল রেডিওটাও নিয়ে যায়। এতদিন কিটির দামি রেডিওটাই ব্যবহার করতাম। ও গুলশানে চলে যাওয়াতে রুমি-জামির নরবড়ে টুইন-ওয়ানটা দিয়ে কোনো মতে কাজ চালাই। কিন্তু এটাতে বিবিসির বাংলা সার্ভিসটা কোনো মতেই ধরা যায় না। আকাশবাণীও ঢাকার রাস্তায় আর্মি নেমেছে, এর বেশি কিছু বলেনি। টিভি বন্ধ। কী আর করি। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে কাজের লোকদের রেহাই দিলাম। সবাই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি, হঠাৎ রুমি থমকে দাঁড়াল, মিকির কোনো সাড়াশব্দ নেই যে? একেবারে নরমাল হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

জামি বলল, ওকে ভেতরে আনা হয়নি।

আমরা আবার সবাই নিচে নামলাম। দরজা খুলে উঠানে নেমে মিকির জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। মোমবাতির কাঁপা কাঁপা আলোয় দেখলাম মিকি মরে পড়ে আছে।

১৬ই ডিসেম্বর

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আজ সকাল ন'টা পর্যন্ত যে আকাশ-যুদ্ধ বিরতির কথা ছিল, সেটা বিকেল তিন-টা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। দুপুর থেকে সারা শহরে ভীষণ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা। পাক আর্মি নাকি সারেন্ডার করবে বিকেলে। সকাল থেকে কলিম,

www.pathagar.com

হুদা, লুলু যারাই এল সবার মুখেই এক কথা। দলে দলে লোক জয় বাংলা ধ্বনি তুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে কারফিউ উপেক্ষা করে। পাক সেনারা, বিহারিরা সবাই নাকি পালাচ্ছে। পালাতে পালাতে পথে-ঘাটে এলোপাতাড়ি গুলি করে বহু বাঙালিকে খুন জখম করে যাচ্ছে। মঞ্জু এলেন তার দুই মেয়েকে নিয়ে, গাড়ির ভেতর বাংলাদেশের পতাকা বিছিয়ে। তিনিও ঐ এক কথাই বললেন। বাদশা এসে বলল, এলিফ্যান্ট রোডের আজিজ মোটরসের মালিক খান জিপে করে পালাবার সময় বেপোরোয়া গুলি চালিয়ে রাস্তার বহু লোক যখম করেছে।

মঞ্জুর যাবার সময় পতাকাটা আমাকে দিয়ে গেলেন। বললেন আজ যদি সারেন্ডার হয়, কাল সকালে এসে পতাকাটা তুলব।

আজ শরীফের কুলখানি। আমার বাসায় যারা আছেন তারাই সকাল থেকে দোয়া দরুদ কুল পড়ছেন। পাড়ার সবাইকে বলা হয়েছে বাদ মাগরীবের মিলাদে আসতে। এ.কে খান, সানু, মঞ্জু, খুকু সবাই বিকেল থেকেই এসে কুল পড়ছে।

জেনারেল নিয়াজী নব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে আজ বিকেল তিন'টার সময়।

যুদ্ধ তাহলে শেষ? তাহলে আর কাদের জন্য সব রসদ জমিয়ে রাখব?

আমি গেস্ট রুমের তালা খুলে চাল, চিনি, ঘি, গরম মসলা বের করলাম কুলখানির জর্দা রাঁধবার জন্য। মা, লালু, অন্যান্য বাড়ির গৃহিণীরা সবাই মিলে জর্দা রাঁধতে বসলেন।

রাতের রান্নার জন্যও চাল, ডাল, আলু, পিঁয়াজ ইত্যাদি এখান থেকেই দিলাম। আগামীকাল সকালের নাস্তার জন্যও ময়দা, ঘি, সুজি, চিনি, গরম মসলা এখান থেকেই বের করে রাখলাম।

১৭ই ডিসেম্বর,
শুক্রবার ১৯৭১

আজ ভোরে বাসায় স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলা হল। মঞ্জুর এসেছিলেন, বাড়িতে যারা আছেন, তারাও সবাই ছাদে উঠলেন। ২৫ মার্চ থেকে ফ্লাগপোলটায় বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে আবার নামিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেই ফ্লাগপোলটাতেই আজ আবার সেই পতাকাটাই তুললাম।

সবাই কাঁদতে লাগলেন। আমি কাঁদতে পারলাম না। জামির হাত শক্ত মুঠিতে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

গত তিনদিন ধরে জামিকে নিয়ে বড়ই দুশ্চিন্তায় আছি। শরীফের মৃত্যুর পর ও কেমন যেন গুম মেরে আছে। মাঝে মাঝেই ক্ষেপে উঠে, চেচামিচি করে,

www.pathagar.com

ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়, বলে পাঞ্জাবি মারবে, বিহারি মারবে, আব্বুর হত্যার প্রতিশোধ নিবে। ওকে যত বোঝাই এখন আর যুদ্ধ নাই, যুদ্ধের সময় পাঞ্জাবি মারলে সেটা হতো শত্রুহনন, এখন মারলে সেটা হবে মার্ডার—ও ততো ক্ষেপে উঠে। কী যে করি! ওর জন্য আমিও কোথাও বেরোতে পারছি না। তাছাড়া এই যে গুষ্ঠি রয়েছে বাড়িতে। গত রাতেই হোসেন সাহেব ও আসলাম সাহেবরা নিজেদের বাড়িতে চলে গেছেন। কিন্তু বাকিরা নড়তে চাইছে না। কী এক দুর্বোধ্য ভয়ে এই ঘরের মেঝে আকড়ে বসে আছে।

আত্মীয়-বন্ধু-পরিচিতজন কত যে আসছে সকাল থেকে স্রোতের মতো। তাদের মুখে শুনছি রমনা রেসকোর্সে সারেন্ডারের কথা, দলে দলে মুক্তিযোদ্ধাদের ঢাকায় আসার কথা, ইন্ডিয়ান আর্মির কথা, লোকজনের বিজয় উল্লাসের কথা। এরই মধ্যে রক্ত হিম করা একটা কথাও শুনছি। মুনীর স্যার, মোফাজ্জল হায়দার স্যার, ডাঃ রাব্বি, ডাঃ আলিম চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়ছার এবং আরো অনেকেরই খোঁজ নেই। গত সাত-আট দিনের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে কারফিউয়ের মধ্যে এদের বাসায় মাইক্রোবাস বা জিপে করে কারা যেন এসে এদের চোখ মুখ বেঁধে ধরে নিয়ে গেছে। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মনে পড়ল গত সাত আটদিনে যখন তখন কারফিউ দেওয়ার কথা। কারফিউয়ের মধ্যে রাস্তা দিয়ে বেসামরিক মাইক্রোবাস ও অন্যান্য গাড়ি চলাচলের কথা। এতক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে উঠল।

বিকেল হতে হতে রায়ের বাজারের বধ্যভূমির খবরও কানে এসে পৌছাল । বড় অস্থির লাগছে। কী করি? কোথায় যাই, কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। রুমি, রুমি কি বেঁচে আছে? আমি কী করে খবর পাব? কার কাছে খবর পাব? শরীফ এমন সময়ে চলে গেল? দু'জনে মিলে রুমির জন্য কষ্ট পাচ্ছিলাম, রুমির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এখন একাই আমাকে সব করতে হবে। একাই সব কষ্ট বহন করতে হবে।

ফোন ও ইলেক্ট্রিকের লাইন এখনো ঠিক হয় নাই। কে ঠিক করবে? সারা ঢাকার লোক একই সঙ্গে হাসছে আর কাঁদছে। স্বাধীনতার জন্য হাসি। কিন্তু হাসিটা ধরে রাখা যাচ্ছে না। এত বেশি রক্তের দাম দিতে হয়েছে যে, কান্নার স্রোতে হাসি ডুবে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে।

সন্ধ্যার পর একটা মোমবাতি জ্বেলে ভূতুড়ে আলোয় জামিকে জড়িয়ে ধরে বসেছিলাম। হঠাৎ দরজায় করাঘাত। তার আগে বাসার সামনে জিপ গাড়ি থামার শব্দ পেয়েছি। উঠে দরজা খুললাম। কাঁধে স্টেনগান ঝোলানো কয়েকটি তরুণ দাঁড়িয়ে। আমি দরজা ছেড়ে দু-পা পিছিয়ে বললাম, এসো বাবারা এসো।

ওরা ঘরে ঢুকে প্রথমে নিজেদের পরিচয় দিল আমি মেজর হায়দার। এ শাহাদাত, এ আলম, ও আনু, এ জিয়া, ও ফতে আর এই যে চলু।

www.pathagar.com

হায়দার আর আনু ছাড়া আর সবাইকেই তো আগে দেখেছি।
চলু এতোদিন সেন্ট্রাল জেলে ছিল। ওকে জেল থেকে বের করে এনে রুমির অনুরাগী এই মুক্তিযোদ্ধারা রুমির মায়ের সাথে দেখা করতে এসেছে।
আমি ওদেরকে হাত ধরে এনে ডিভানে বসলাম। আমি শাহদাতের হাত থেকে চাইনিজ স্টেনগানটা আমার হাতে তুলে নিলাম। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। তারপর সেটা জামির হাতে তুলে দিলাম। চলু মাটিতে হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসল। আমার দুই হাত টেনে তার চোখ ঢেকে আমার কোলে মাথা গুঁজল। আমি হায়দারের দিকে তাকিয়ে বললাম, জামি পারিবারিক অসুবিধার কারণে মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারেনি। ও একবারে পাগল হয়ে আছে। ওকে কাজে লাগাও।
মেজর হায়দার বলল, ঠিক আছে জামি এই মুহূর্ত থেকে তুমি আমার বডি গার্ড হলে। এক্ষুনি আমার সঙ্গে আমার অফিসে চল, তোমাকে একটা স্টেন ইস্যু করা হবে। তুমি গাড়ি চালাতে পার?
জামি সটান এ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে ঘটাং করে এক স্যালুট দিয়ে বলল, পারি। ঠিক আছে তুমি আমার গাড়িও চালাবে।
জামির পাশেই আলী দাঁড়িয়ে ছিল। জামি বলল স্যার আমার বন্ধু আলী, মেজর হায়দার গম্ভীর মুখে বলল ইনফ্যাক্ট আমার দুজন বডিগার্ড দরকার, তোমার বন্ধুকেও অ্যাপয়েনমেন্ট দেওয়া গেল। কিন্তু ভেবে দেখ, পারবে কি-না। এটা খুব টাফ জব। চব্বিশ ঘণ্টার ডিউটি।
পাঁচদিন পর জামি এই প্রথমবারের মতো দাঁত বের করে হাসল, আটচল্লিশ ঘণ্টার হলেও পরোয়া নেই।
যেহেতু আমার স্বচক্ষে দেখার কোনো স্মৃতি নেই, তাই এই পরনির্ভরশীলতা। আমি এবং আমরা সবাই তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আগামী দিনে যারা যুদ্ধের কথা যানতে চাইবে তাদের জন্য সংক্ষেপে হলের যুদ্ধের দিনগুলোর কথা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।
'৭০-এর ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে যারা প্রাদেশিক পরিষদ ও জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের নিয়ে জাতীয় পরিষদের অধীবেশন ১৫ই ফেব্রুয়ারি বসুক সেই দাবি করেছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তা শুনলেন না। তিনি শুনলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি তাই ১৩ই ফেব্রুয়ারি ভুট্টোর কথা মতো ৩রা মার্চ গণপরিষদের অধিবেশন বসবে এই মর্মে ঘোষণা দিলেন। কিন্তু ১লা মার্চ মুজিবের সাথে কোনো প্রকার আলোচনা ছাড়াই ভুট্টোর কথামতো ৩রা মার্চের অধিবেশন স্থগিত করেন। স্বাধীন-বাংলা ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ গঠিত ফার্মগেটে মিছিলে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণ আওয়ামী-লীগ

www.pathagar.com

কর্তৃক ৩রা মার্চ জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা, ২রা মার্চ কলাভবনে ছাত্র সভায় শিব নারায়ণ দাস কর্তৃক পরিকল্পিত ও অঙ্কিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রথম বারের জন্য উত্তোলন করা হয়। ৩মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ ও শ্রমিকলীগ এক জনসভার আয়োজন করে। উক্ত জনসভায় জনগণের চাপ থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক স্বাধীনতার প্রথম ইশতেহার পাঠ করা হয়। উক্ত জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, হয়ত এই আমার শেষ ভাষণ।... আমি যদি না থাকি, আন্দোলন যেন থেমে না থাকে। আমি মরে গেলেও সাত কোটি মানুষ দেখবে দেশ সত্যিকারের স্বাধীন হয়েছে।

www.pathagar.com

মুজিবনগর থেকে ঢাকা : এক সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা

১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এদেশের স্বাধীনতার শেষ সূর্য অস্তমিত হন। তারপরও এই ভূখণ্ডে অনেক সূর্যোদয় হয়েছে। সেই সূর্য আবার পশ্চিমাকাশে লাল আভা নিয়ে অস্তমিত হয়েছে। কিন্তু বাঙালির ভাগ্যাকাশে ২১৩টি বছর যে সূর্যোদয় হয়েছে তা ছিল পরাধীনতার সূর্য। প্রতিটি সূর্যোদয় নিয়ে এসেছে বাঙালির জন্যে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনা-বিড়ম্বনা। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এই জনপদে আবারও স্বাধীনতার সূর্যোদয় হয়। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালির জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে স্বাধীনতার সোনালি সূর্য আবারও আমাদের মুঠোবন্দি হয়। এর মধ্যে জড়িয়ে আছে টানা দুদুটো শতাব্দী, সহস্র গল্পগাঁথা। কোনো একটি একক লেখায় যার পুরোটুকুতো দূরে থাক সারমর্মও তুলে ধরা সম্ভব নয়। ১৯০ বছরের ইংরেজ শাসন, ২৩ বছরের পাকিস্তানী শাসন কেবল দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা আর বঞ্চনার ইতিহাস। বাঙালির পক্ষে কোনোদিনও এটা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

১৯৭১-এর ২৬শে মার্চে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় অস্থায়ী প্রবাসী সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

স্বাধীনতার ঘোষণা

এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারির মোকাবেলা করার জন্য আমি আহব্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র
মুজিব নগর, বাংলাদেশ, ১০ই এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত একটি শাসনতন্ত্র রচনার অভিপ্রায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জনই আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত করেছিল।

এবং

যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহবান করেন।

এবং

যেহেতু আহুত এ পরিষদ স্বেচ্ছাচার ও বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

এবং

যেহেতু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্তে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলাকালে একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে।

এবং

যেহেতু উল্লেখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্যে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জনান।

এবং

www.pathagar.com

যেহেতু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনাকালে বাংলাদেশের অসামরিক ও নিরস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে অগুণিত গণহত্যা ও নজিরবিহীন নির্যাতন চালিয়েছে এবং এখনো চালাচ্ছে।

এবং

যেহেতু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একত্র হয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে ও নিজেদের সরকার গঠন করতে সুযোগ করে দিয়েছেন।

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাদের বীরত্ব, সাহসীকতা ও বিপবী কার্যক্রমের দ্বারা বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন।

সেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে যে রায় দিয়েছেন সে মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের সমবায়ে গণ-পরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং এতদ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি। এবং এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

এবং

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক হবেন, রাষ্ট্রপ্রধানই ক্ষমা প্রদর্শনসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী হবেন,

তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী ও প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য নিয়োগ করতে পারবেন,

রাষ্ট্রপ্রধানের কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের এবং গণপরিষদের অধিবেশন আহবান ও মুলতবির ক্ষমতা থাকবে এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্যে আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্যা সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, যে কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি অক্ষম হন, তবে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দ্বায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছে তা আমরা যথাযথভাবে পালন করব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের স্বাধীনতার এ ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্যে আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে ক্ষমতা দিলাম।

এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলাম।

www.pathagar.com

তাজউদ্দিন আহমদের ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১-এর ভাষণ

তাজউদ্দীন আহম্মেদ ছিলেন বাংলাদেশের একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর একান্ত বিশ্বস্ত সহযোগী। তিনি ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত আওয়ামীলীগ এর জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী "অপারেশন সার্চলাইট" পরিচালনা করলো, পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে। তখন তাজউদ্দীন আহমেদ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুললেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শেখ মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তানে গ্রেফতার করলেন। তিনি তখন মুজিব নগরকে রাজধানী ঘোষণা করলেন। তাজউদ্দীন আহমেদ বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করলেন মুজিব নগরে। যা মুজিব নগর সরকার নামে পরিচিত। মুজিব নগর কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে অবস্থিত। তাজউদ্দীন আহমেদ ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে মুজিব নগরে একটি ভাষণ দেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের ভাষণ :
আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য যে, তারা আমাদের আমন্ত্রণে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি দেখে যাবার জন্য বহু কষ্ট করে দূর-দূরান্ত থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন।
আমি কিছু বলবার আগে প্রথমেই বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সংবাদপত্র সেবী ও নিউজ এজেন্সির প্রতিনিধিদেরকে যে, তারা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে আগাগোড়া সমর্থন দিয়ে গিয়েছেন এবং সত্য কথা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। যদিও ইয়াহিয়া সরকার তাদেরকে এবং তার সেই দস্যুবাহিনী বিদেশি সাংবাদিকদেরকে ভেতরে আসতে দেয়নি, যারা ভিতরে ছিলেন তাদেরকেও জবরদস্তি করে ২৫ তারিখ রাতেই বের করে দিয়েছেন। আমি

www.pathagar.com

আপনাদেরকে আরও ধন্যবাদ দিচ্ছি, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই জন্য যে, আমার বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের যে সংগ্রাম, স্বাধীনতা সংগ্রাম সেই সংগ্রাম কোনো অবস্থাতেই যেন ব্যাহত না হয় এবং কোনো অবস্থাতেই সে সংগ্রামকে ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া না হয় সে জন্য আপনারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

আমি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে আবেদন জানাব ভবিষ্যতেও আপনারা দয়া করে চেষ্টা করবেন যাতে সঠিক সংবাদ পরিবেশিত হয়, যাতে কোনো দুষ্কৃতিকারী বা কোনো শত্রু বা এজেন্ট ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের আন্দোলনের কোনো ভুল ব্যাখ্যা করতে না পারে, ভুল বোঝাতে না পারে। সেই সাথে আমি আপনাদেরকে আরও অনুরোধ জানাব আমাদের বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যে হ্যান্ড আউট যাবে সেটাকেই বাংলাদেশ সরকারের সঠিক ভাষ্য বলে ধরে নিবেন, সেটাকেই ভিত্তি হিসেবে ধরে নিবেন। আর আমি আপনাদের আরও একটি অনুরোধ জানাব জানি না কিভাবে সেটা সম্ভব হবে, আমাদের বাংলাদেশের মাটি থেকে আপনারা কিভাবে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবেন, কিভাবে বাংলাদেশ সরকারের সাথে লিয়াজো করতে পারেন সেই ব্যাপারে আপনারা চিন্তা করে দেখবেন এবং সেই ব্যাপারে আপনাদের পরামর্শ আমরা অত্যন্ত সাদরে, আনন্দের সাথে গ্রহণ করব।

এখন আমি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমার ভাষ্য তুলে ধরব। বাংলাদেশ এখন যুদ্ধে লিপ্ত। পাকিস্তানের ঔপনিবেশবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণাধীকার অর্জন ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো বিকল্প নাই। বাংলাদেশে গণহত্যার আসল ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকারের অপপ্রচারের মুখে বিশ্ববাসীকে অবশ্যই জানাতে হবে। কিভাবে বাংলার শান্তিকামী মানুষ সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতিকেই বেছে নিয়েছিল। তবেই তারা বাংলাদেশের ন্যায় সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে আওয়ামী লীগ পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ৬ দফার আলোকে বাংলাদেশের জন্য স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিলেন। ১৯৭০-এ আওয়ামী লীগ এই ৬ দফা নির্বাচনী ইসতেহারের ভিত্তিতেই পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩ টি আসনের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ১৬৯ টি আসনের মধ্যে মোট ১৬৭ টি আসন লাভ করেছিল। নির্বাচনী বিজয় এতই চূড়ান্ত ছিল যে,

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ মোট শতকরা ৮০টি ভোট পেয়েছিল। এই বিজয়ের চূড়ান্ত রায়েই আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

স্বভাবতই নির্বাচন পরবর্তী সময়টি ছিল আমাদের জন্য এক আশাময় দিন। কারণ সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণের এমনি চূড়ান্ত রায় ছিল অভূতপূর্ব। দুই প্রদেশের জনগণই বিশ্বাস করেছিলেন যে, এবার ৬ দফার ভিত্তিতে উভয় প্রদেশের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য গঠনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব হবে। তবে সিন্ধু ও পাঞ্জাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টি তাদের নির্বাচন অভিযানে ৬ দফাকে এড়িয়ে গিয়েছিল। কাজেই ৬ দফাকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার জন্যে জনগণের কাছে এই দলে জবাবদিহি ছিল না। বেলুচিস্তানের নেতৃস্থানীয় দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ছিল ৬ দফার পূর্ণ সমর্থক। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদশের প্রভাবশালী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও ৬ দফার আলোকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী ছিল। কাজেই প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাজয় সূচনাকারী '৭০-এর নির্বাচনে পাকিস্তান গণতন্ত্রের আশাপ্রদ ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত বহন করেছিল।

আশা করা গিয়েছিল যে, জাতীয় পরিষদ আহবানের প্রস্তুতি হিসেবে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো আলোচনায় বসবে। এমনি আলোচনার প্রস্তাব এবং পাল্টা প্রস্তাবের ওপর গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা উপস্থাপনের জন্য আওয়ামী লীগ সবসময়ই সম্মত ছিল। তবে এই দল বিশ্বাস করেছে যে, যথার্থ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জাগ্রত রাখার জন্য গোপনীয় সম্মেলনের পরিবর্তে জাতীয় পরিষদেই গঠনতন্ত্রের ওপর বিতর্ক হওয়া উচিত। এরই প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ চেয়েছিল যথাসত্ত্বর জাতীয় পরিষদ আহবানের জন্য। আওয়ামী লীগ আসন্ন জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে একটি খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে লেগে গেল এবং এধরনের একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়নের সব আইনগত এবং বাস্তব দিকও পরীক্ষা করে দেখল।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ওপর আলোচনার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারি '৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে। এই বৈঠকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান আওয়ামীলীগের ৬ দফাভিত্তিক কর্মসূচিকে বিশ্লেষণ করলেন এবং ফল কী হতে পারে তারও নিশ্চিত ভরসা নিলেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে। কিন্তু প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান তার নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকলেন। তিনি এমন এক ভাব দেখালেন যে, ৬ দফায় সাংঘাতিক আপত্তি জনক। কিছুই তিনি খুঁজে পাননি তবে পাকিস্তান পিপলস পার্টির সাথে সমঝোতায় আসার উপর তিনি জোর দিলেন।

www.pathagar.com

পরবর্তী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং আওয়ামী লীগের সাথে ঢাকায় ২৭ জানুয়ারি ১৯৭১। জনাব ভুট্টো এবং তার দল আওয়ামী লীগের সাথে গঠনতন্ত্রের উপর আলোচনার জন্য এসময়ে কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হন।

ইয়াহিয়ার ন্যায় ভুট্টোও গঠনতন্ত্রের অবকাঠামো সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আনয়ন করেননি। বরং তিনি এবং তার দল ৬ দফায় বাস্তব ফল কী হতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনার প্রতিই অধিক ইচ্ছুক ছিলেন। যেহেতু এ ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল না সূচক এবং যেহেতু এ নিয়ে তাদের কোনো তৈরি বক্তব্যও ছিল না সেহেতু এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপস ফর্মুলায় আসাও সম্ভব ছিল না। অথচ দুই দলের মধ্য মতানৈক্য দূর করার জন্য প্রচেষ্টার দুয়ার সবসময়ই খোলা ছিল। এই আলোচনা বৈঠক থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কোন পর্যায় থেকে আপস ফর্মুলায় আসা সম্ভব সে সম্পর্কেও জনাব ভুট্টোর নিজস্ব কোনো বক্তব্য ছিল না।

এখানে একটি কথা আরও পরিষ্কারভাবে বলে রাখা দরকার যে, আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এ ধরনের কোনো আভাসও পাকিস্তান পিপলস পার্টি ঢাকা ত্যাগের আগে দিয়ে যাননি। উপরন্তু তারা নিশ্চয়তা দিয়ে গেলেন যে, আলোচনার জন্য সব দরজাই খোলা রয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনার পর পাকিস্তান পিপলস পার্টি আওয়ামী লীগের সাথে দ্বিতীয় দফায় আরো অধিক ফলপ্রসু আলোচনায় বসবেন। অথবা জাতীয় পরিষদে তারা ভিন্ন আলোচনায় বসার জন্য অনেক সুযোগ পাবেন।

পরবর্তী পর্যায়ে জনাব ভুট্টোর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বয়কটের সিদ্ধান্ত সবাইকে বিস্মিত ও হতবাক করে। তার এই সিদ্ধান্ত এই জন্যই সবাইকে আরো বেশি বিস্মিত করে যে, শেখ মুজিবের দাবি মোতাবেক ১৫ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান না করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভুট্টোর কথামতোই ৩ই মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকেছিলন। পরিষদ বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে সমস্ত দলের সদস্যের বিরুদ্ধে ভিতি প্রদর্শনের অভিযান শুরু করেন। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে পরিষদের অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত রাখা। এ কজে ভুট্টোর হস্তকে শক্তিশালী করার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ সহোচর লে. জেনারেল ওমর ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের উপর পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। জনাব ভুট্টো ও লে. জেনারেল ওমরের চাপ সত্ত্বেও পিপিপি ও কাইয়ুম লীগের

www.pathagar.com

সদস্যগণ ব্যতীত অপরাপর দলের সমস্ত সদস্যই ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য পূর্ববাংলায় গমনের টিকিট বুক করেন। এমনকি কাইয়ুম লীগের অর্ধেক সংখ্যক সদস্য তাদের আসন বুক করেন। এমনও আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছিল যে, পিপিপির বহু সদস্য দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ঢাকায় আসতে পারেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেও যখন কোনো কূলকিনারা পাওয়া যাচ্ছিল না তখন ১ মার্চ অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন জেনারেল ইয়াহিয়া তার দোস্ত ভুট্টোকে খুশি করার জন্য। শুধু তাই নয় জেনারেল ইয়াহিয়া পূর্ববাংলার গভর্নর আহসানকেও বরখাস্ত করলেন। গভর্নর আহসান ইয়াহিয়া প্রশাসনের মধ্যপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন। বাঙালিদের সংমিশ্রণে কেন্দ্রে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল তাও বাতিল করে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানি মিলিটারি জান্তার হাতে তুলে দেওয়া হলো।

এমতাবস্থায় ইয়াহিয়ার সমস্ত কার্যক্রমকে কোনো ক্রমেই ভুট্টোর সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে বাংলাদেশের গণরায় বাঞ্চাল করার প্রয়াস ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। জাতীয় পরিষদই ছিল একমাত্র স্থান। যেখানে বাংলাদেশ তার বক্তব্য কার্যকরী করতে পারত এবং রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন করতে পারত। এটাকে বাঞ্চাল করার চেষ্টা চলতে থাকে। চলতে থাকে জাতীয় পরিষদকে সত্যিকার ক্ষমতার উৎস না করে একটা ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করার।

জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের স্থগিতের প্রতিক্রিয়া যা হবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল তাই হয়েছে। ইয়াহিয়ার এই স্বৈরাচারী কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য সারা বাংলাদেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে পড়ে। কেননা বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো ইচ্ছাই ইয়াহিয়া খানের নেই এবং তিনি পার্লামেন্টারি রাজনীতির নামে তামাশা করছেন। বাংলাদেশের জনগণ এটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, এক পাকিস্তানের কাঠামো বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। ইয়াহিয়া নিজেই আহবান করে আবার নিজেই যেভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন তা থেকেই বাঙালি শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তাই তারা একবাক্যে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর চাপ দিতে থাকেন।

শেখ মুজিব এতদসত্ত্বেও সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। ৩ মার্চ অসহযোগ কর্মসূচির আহবান জানাতে গিয়ে তিনি দখলদার বাহিনীকে মোকাবিলার জন্য শান্তির অস্ত্রই বেছে নিয়েছিলেন। তখনো তিনি আশা করছিলেন যে, সামরিক চক্র তাদের জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে

www.pathagar.com

পাবে। গত ২ ও ৩ মার্চ ঠাণ্ডা মাথায় সামরিক চক্র কর্তৃক হাজার হাজার নিরস্ত্র ও নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যা করার মুখে বঙ্গবন্ধুর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

শেখ সাহেবের অসহযোগ আন্দোলন আজ ইতিহাসের অন্তর্গত। অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি সৃষ্টি করলেন এক নতুন ইতিহাস। বাংলাদেশে ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন যেভাবে এগিয়ে গেছে মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে তার নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। এত কার্যকর অসহযোগ আন্দোলন কোথাও সাফল্য লাভ করেনি। পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন চলছে দেশের সর্বত্র। নতুন গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খানের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য পাওয়া গেল না হাইকোর্টের কোনো বিচারপতি। পুলিশ এবং পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসসহ গণপ্রশাসন বিভাগের কর্মচারিগণ কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। জনগণ সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিল। এমনকি সামরিক দপ্তরের অসামরিক কর্মচারিগণ তাদের অফিস বয়কট করলেন। কেবল কাজে যোগদান থেকে বিরত থেকে ক্ষান্ত হলেন না, অসামরিক প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের লোকেরাও সক্রিয় সমর্থন ও নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করলেন শেখ সাহেবের প্রতি। তারা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, আওয়ামী লীগ প্রশাসনের নির্দেশ ছাড়া তারা অন্য কারও নির্দেশ মেনে চলবে না।

এ অবস্থায় মুখোমুখি হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতাসীন না হয়েও অসহযোগের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণে আওয়ামীলীগ বাধ্য হলো। এ ব্যাপারে শুধু আপামর জনগণই নয়, বাংলাদেশের প্রশাসন ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন লাভ তারা করেছিলেন। তারা আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলি সর্বান্তকরণে মাথা পেতে মেনে নিলেন এবং সমস্যাবলির সামাধানে আওয়ামী লীগকে একমাত্র কর্তৃপক্ষ বলে গ্রহণ করলেন। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ফাটল ধরলে দেখা দেয় নানাবিধ দুরূহ সমস্যা। কিন্তু এসব সমস্যার মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দপ্তরের কাজ যথারীতি এগিয়ে যাচ্ছিল। বাংলাদেশের কোন আইনানুগ কর্তৃপক্ষ না থাকা সত্ত্বেও পুলিশের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকগণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তা স্বাভাবিক সময়েও অন্যদের অনুকরণীয় হওয়া উচিত। আওয়ামী লীগ ও ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি জনগণের সর্বাধিক সমর্থন দৃষ্টে জেনারেল ইয়াহিয়া তার কৌশল পাল্টালেন। ৬ মার্চ ইয়াহিয়াকে একটা কনফ্রন্টেশনের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে মনে হলো। কেননা তার ঐদিনের প্ররোচনামূলক

www.pathagar.com

বেতার বক্তৃতায় সঙ্কটের সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপালেন আওয়ামী লীগের ওপর। অথচ যিনি ছিলেন সঙ্কটের স্থপতি সেই ভুট্টো সম্পর্কে তিনি একটি কথাও বললেন না। মনে হয় তিনি ধারণা করেছিলেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তা নির্মূল করার জন্য ঢাকার সেনাবাহিনীকে করা হয় পূর্ণ সতর্কীকরণ। লে. জেনারেল ইয়াকুব খানের স্থলে পাঠানো হলো লে. জেনারেল টিক্কা খানকে। এই রদবদল থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় সামরিক জান্তার ঘৃণ্য মনোভাবের পরিচয়।

কিন্তু ইতিমধ্যেই মুক্তি পাগল মানুষ স্বাধীনতা লাভের জন্য পাগল হয়ে উঠে। এ সত্ত্বেও শেখ মুজিব রাজনৈতিক সমাধানের পথে অটল থাকেন। জাতীয় পরিষদে যোগদানের ব্যাপারে তিনি যে ৪ দফা প্রস্তাব পেশ করেন তাতে যেমন একদিকে প্রতিফলিত হয়েছে জনগণের ইচ্ছা, অন্যদিকে শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানোর জন্য ইয়াহিয়াকে দেওয়া হয় তার শেষ সুযোগ।

বর্তমান অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে এটি অবশ্যই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ইয়াহিয়া এবং তার জেনারেলদের ছিল না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শক্তিকে জোরদার করার জন্য কালক্ষেপণ করা। ইয়াহিয়ার ঢাকা সফর ছিল আসলে বাংলাদেশে গণহত্যা পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এটা আজ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, অনুরূপ একটি সৃষ্টির পরিকল্পনা বেশ আগেভাগেই নেয়া হয়েছিল।

১ মার্চের ঘটনার সামান্য কিছু আগে রংপুর থেকে সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত ট্যাঙ্কগুলো ফেরত আনা হয়। ১ মার্চ থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানি কোটিপতি ব্যবসায়ী পরিবার সমূহের সাথে সেনাবাহিনীর লোকদের পরিবার পরিজনদেরকেও পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হতে থাকে।

১ লা মার্চের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শক্তি গড়ে তোলার কাজ ত্বরান্বিত করা হয় এবং তা ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলে। সিংহলের পথে পিআইয়ের কমার্শিয়াল ফ্লাইটে সাদা পোশাকের সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের এদেশে আনা হলো। সি ১৩০ পরিবহন বিমানগুলোর সাহায্যে অস্ত্র এবং রসদ এনে পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপিত করা হয়।

হিসাব নিয়ে জানা গেছে, ১লা মার্চ থেকে ২৫ শে মার্চের মধ্যে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামসহ অতিরিক্ত এক ডিভিশন সৈন্য এদেশে আমদানি করা হয়। ব্যাপারটা নিরাপদ করার জন্য ঢাকা বিমানবন্দরকে বিমানবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সমগ্র বিমানবন্দর এলাকায় আর্টিলারি ও মেশিনগানের জাল বিস্তার করা হয়। যাত্রীদের আগমন-নির্গমনের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু

www.pathagar.com

করা হয়। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও হত্যাকাণ্ড সংগঠনে ট্রেনিংপ্রাপ্ত একদল এসজি কমান্ডো গ্রুপ এ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ছেড়ে দেওয়া হয়। ২৫ শে মার্চের পূর্ববর্তী দুই দিনে ঢাকা ও সৈয়দপুরে যেসব কুকাণ্ড ঘটে এরাই সেগুলো সংঘটন করেছিল। সামরিক হস্তক্ষেপের অজুহাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্থানীয় ও অস্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে একটা উত্তেজনার পরিবেশ খাড়া করাই ছিল এসবের উদ্দেশ্য।

প্রতারণা বা ভণ্ডামির এই স্ট্রাটেজি গোপন করার অংশ হিসেবেই ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সাথে তার আলোচনায় আপসমূলক মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। ১৬ই মার্চ আলোচনা শুরু হলে ইয়াহিয়া তৎপূর্বে যা ঘটেছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে ইয়াহিয়ার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল আওয়ামী লীগের ক্ষমতা হস্তান্তরের ৪ দফা শর্তের প্রতি সামরিক জান্তার মনোভাব কী? জবাবে ইয়াহিয়া জানান যে, ৪ দফা শর্ত পূরণের ভিত্তিতে উভয় পক্ষের উপদেষ্টাগণ একটা অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সক্ষম হবেন।

আলোচনাকালে যেসব মৌলিক প্রশ্নে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলো হলো :

১। মার্শাল ল বা সামরিক আইন প্রত্যাহার করে প্রেসিডেন্টের একটি ঘোষণার মাধ্যমে একটি বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।

২। প্রদেশগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।

৩। ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করবেন।

৪। জাতীয় পরিষদ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যগণ পৃথক পৃথকভাবে বৈঠকে মিলিত হবেন।

আজ ইয়াহিয়া ও ভুট্টো জাতীয় পরিষদের পৃথক পৃথক অধিবেশনের প্রস্তাবের বিকৃত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। অথচ ইয়াহিয়া নিজেই ভুট্টোর মনোনয়নের জন্য এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ প্রস্তাবের সুবিধা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইয়াহিয়া সেদিন নিজেই বলেছিলেন যে, ৬ দফা হলো বাংলাদেশের এবং কেন্দ্রের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ের এক নির্ভরযোগ্য নীল নকশা। পক্ষান্তরে, এটার প্রয়োগ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সৃষ্টি করবে নানারূপ অসুবিধা। এমতাবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানি এমএনএদের পৃথকভাবে বসে ৬ দফার ভিত্তিতে রচিত শাসনতন্ত্র এবং এক ইউনিট ব্যবস্থা বিলোপের আলোকে একটা নতুন ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে।

শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যকার এই নীতিগত মতৈক্যের পর একটি মাত্র প্রশ্ন থেকে যায় এবং তা হলো অন্তর্বর্তী পর্যায়ে কেন্দ্র ও বাংলাদেশের মধ্যে

www.pathagar.com

বন্টন। এক্ষেত্রেও উভয় পক্ষ এই মর্মে একমত হয়েছিলেন যে, ৬ দফার ভিত্তিতে অদূর ভবিষ্যতে যে শাসনতন্ত্র রচিত হতে যাচ্ছে মোটামুটি তার আলোকেই কেন্দ্র বাংলাদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন হবে। অন্তর্বর্তীকালীন মীমাংসার এই সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এমএম আহমদকে বিমানে করে ঢাকা আনা হয়। আওয়ামী লীগ উপদেষ্টাদের সাথে আলাপ আলোচনায় তিনি স্পষ্টভাবে একথা বলেন যে, রাজনৈতিক মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৬-দফা কার্যকর করার প্রশ্নে দুর্লভ কোনো সমস্য দেখা দেবে না। এমনকি অন্তর্বর্তী পর্যায়েও না।

আওয়ামী লীগের খসরার উপর তিনি যে তিনটি সংশোধনী পেশ করেছিলেন তাতে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, সরকার ও আওয়ামী লীগের মধ্যে তখন যে ব্যবধানটুকু ছিল তা নীতিগত নয়, বরং কোথায় কোন শব্দ বসবে তা নিয়ে। ২৪ শে মার্চের বৈঠকে ভাষার সামান্য রদবদলসহ সংশোধনীগুলো আওয়ামী লীগ গ্রহণ করে। অতঃপর অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র চূড়ান্তকরণের উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া ও মুজিবের উপদেষ্টাদের শেষ দফা বৈঠকে মিলিত হওয়ার পথে আর কোনো বাধাই ছিল না।

এ প্রসঙ্গে একটা জিনিস পরিষ্কার করে বলতে হয়, কোন পর্যায়েই আলোচনা অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়নি। অথচ ইয়াহিয়া বা তার উপদেষ্টারা আভাস ইঙ্গিতেও এমন কোনো কথা বলেননি যে, তাদের এমন একটা বক্তব্য আছে যা থেকে তারা নড়চড় করতে পারেন না।

গণহত্যাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরে আইনগত ছত্রছায়ার প্রশ্নেও আজ জোচ্চুরির আশ্রয় নিয়েছেন। আলোচনায় তিনি এবং তার দলবল একমত হয়েছিলেন যে, ১৯৪৭ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে যেভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের আইনগত ছত্রছায়ার ব্যাপারে ভুট্টো পরবর্তীকালে যে ফ্যাকড়া তুলেছেন ইয়াহিয়া তাই অনুমোদন করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার ইয়াহিয়া ঘুণাক্ষরেও এ সম্পর্কে কিছু জানাননি। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য জাতীয় পরিষদের একটা অধিবেশন বসা দরকার, ইয়াহিয়া যদি আভাস ইঙ্গিতেও একথা বলতেন তাহলে আওয়ামী লীগ নিশ্চয়ই আপত্তি করত না। কেননা এমন একটা সামান্য ব্যাপারকে উপেক্ষা করে আলোচনা বাঞ্চাল করতে দেওয়া যায় না। তাছাড়া জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভয় করার কিছুই ছিল না। দেশের দুই অংশের জাতীয় পরিষদের সদস্যদের পৃথক পৃথক বৈঠকের যে প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ সম্মতি দিয়েছিল, তা শুধু ভুট্টোকে খুশি করার জন্যই করা হয়েছিল। এটা কোনো সময়ই আওয়ামী লীগের মৌলিক নীতি ছিল না।

www.pathagar.com

২৪ শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া এবং আওয়ামী লীগ উপদেষ্টাদের মধ্যে চূড়ান্ত বৈঠকে এম এম আহমদ তার সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। এ খসড়া প্রস্তাবের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জেনারেল পীরজাদার আহবানে একটা চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। দুঃখের বিষয় কোনো চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। বরং এম.এম আহমদ আওয়ামীলীগকে না জানিয়ে ২৫ শে মার্চ করাচি চলে গেলেন।

২৫ শে মার্চ রাত ১১টা নাগাদ সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় এবং সেনাবাহিনী শহরে পজিশন গ্রহণ করতে থাকে। মধ্যরাত নাগাদ ঢাকা শহরের শান্তিপ্রিয় জনগণের ওপর পরিচালনা করা হলো গণহত্যার এক পূর্বনির্দিষ্ট কর্মসূচি। অনুরূপ বিশ্বাসঘাতকতার নজির সমসাময়িক ইতিহাসের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগকে দেননি কোনো চরমপত্র। অথবা মেশিনগান, আর্টিলারি সুসজ্জিত ট্যাঙ্কসমূহ যখন মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও ধ্বংসলীলা শুরু করে দিল তার আগে জারি করা হয়নি কোনো কারফিউ অর্ডার। পরদিন সকালে লে. জেনারেল টিক্কা খান তার প্রথম সামরিক নির্দেশ জারি করলেন বেতার মারফত। কিন্তু ৫০ হাজার লোক তার আগেই প্রাণ হারিয়েছেন বিনা প্রতিরোধে। এদের অধিকাংশই ছিল নারী ও শিশু। ঢাকা শহর পরিণত হয় নরককুণ্ডে। প্রতিটি অলিগলি আনাচে কানাচে চলতে লাগল নির্বিচারে গুলি। সামরিক বাহিনীর লোকদের নির্বিচারে অগ্নিসংযোগের মুখে অন্ধকারে বিছানা ছেড়ে যে সব মানুষ বের হওয়ার চেষ্টা করল তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয় মেশিনগানের গুলিতে।

আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণের মুখেও পুলিশ ও ইপিআর বীরের মতো লড়ে গেল। কিন্তু দুর্বল, নিরীহ মানুষ কোনো প্রতিরোধ দিতে পারল না। তারা মারা গেল হাজারে হাজারে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নির্দেশে সেনাবাহিনী যে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে আমরা তার একটা নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রস্তুত করছি এবং শিগগিরই তা প্রকাশ করব। মানুষ সভ্যতার ইতিহাসে যে বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী আমরা শুনেছি, এদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা তার সবকিছুকে ম্লান করে দিয়েছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে ২৫ শে মার্চ রাতে ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করলেন। যাওয়ার আগে তিনি তাদেরকে দিয়ে গেলেন বাঙালি হত্যার এক অবাধ লাইসেন্স। কেন তিনি এই বর্বরতার আশ্রয় নিয়েছিলেন, পরদিন রাত ৮টার সময় বিশ্ববাসীকে জানাতে হলো এর কৈফিয়ত। এই বিবৃতিতে তিনি নরমেধযজ্ঞ সংগঠনের একটা ব্যাখ্যা বিশ্ববাসীকে জানালেন। তার বক্তব্য একদিকে ছিল পরস্পরবিরোধী এবং অন্যদিকে ছিল মিথ্যার

www.pathagar.com

বেসাতিতে ভরা। মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগেও যে দলের সাথে তিনি শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন সে দলের লোকদের দেশদ্রোহী ও দলটিকে অবৈধ ঘোষণার সাথে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বা আলাপ-আলোচনায় কোনো সঙ্গতি খুঁজে পেল না বিশ্ববাসী। বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল এবং জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের অধিকারী আওয়ামীলীগকে বেআইনি ঘোষণা করে গণপ্রতিনিধিদের হাতে তার ক্ষমতা হস্তান্তরের ওয়াদাকে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অবাধ মত প্রকাশের প্রতি তামাশা ছাড়া মানুষ আর কিছু ভাবতে পারল না। তার বক্তব্য থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হলো যে, ইয়াহিয়া আর যুক্তি বা নৈতিকতার ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে চান না এবং এদেশের মানুষকে নির্মূল করার জন্য জঙ্গি আইনের আশ্রয় নিতে বদ্ধপরিকর।

পাকিস্তান আজ মৃত এবং অসংখ্য আদম সন্তানের লাশের তলায় কবর রচিত হয়েছে। বাংলাদেশে যে শত সহস্র মানুষের মৃত্যু হয়েছে তা পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হিসেবে বিরাজ করছে। পূর্ব পরিকল্পিত গণহত্যায় মত্ত হয়ে ওঠার আগে ইয়াহিয়ার ভাবা উচিত ছিল তিনি নিজেই পাকিস্তানের কবর রচনা করছেন। তারই নির্দেশে তার লাইসেন্সধারী কসাইরা জনগণের উপর যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে তা কোনো মতেই একটা জাতীয় ঐক্যের অনুকূল ছিল না। বর্ণগত বিদ্বেষ এবং একটা জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়াই ছিল এর লক্ষ্য। মানবতার লেশমাত্রও এদের মধ্যে নেই। উপরওয়ালাদের নির্দেশে পেশাদারি সৈনিকরা লঙ্ঘন করেছে তাদের সামরিক নীতিমালা এবং ব্যবহার করেছে শিকারি পশুর মতো। তারা চালিয়েছে হত্যাযজ্ঞ, নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নির্বিচারে ধ্বংসলীলা। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে এর নজির নেই। এসব কার্যকলাপ থেকে এ কথারই আভাস মেলে যে, ইয়াহিয়া ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের মনে দুই পাকিস্তানের ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে। যদি না হতো তাহলে তারা একই দেশের মানুষের উপর এমন নির্মম বর্বরতা চালাতে পারত না। ইয়াহিয়ার এই নির্বিচারে গণহত্যা আমাদের জন্য রাজনৈতিক দিক থেকে অর্থহীন নয়। তার এ কাজ পাকিস্তানের বিয়োগান্ত এই মর্মান্তিক ইতিহাসের শেষ অধ্যায়, যা ইয়াহিয়া রচনা করেছেন বাঙালির রক্ত দিয়ে। এদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়া বা নির্মূল হওয়ার আগে তারা গণহত্যা ও পোড়ামাটি নীতির মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে শেষ করে দিয়ে যেতে চায়। ইত্যবসরে ইয়াহিয়ার লক্ষ্য হলো আমাদের রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী মহল ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে নির্মূল করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারখানা, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস

www.pathagar.com

করা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে শহরগুলোকে ধূলিসাৎ করা, যাতে একটি জাতি হিসেবে কোনো দিনই আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি।

ইতোমধ্যে এই লক্ষ্যপথে সেনাবাহিনী অনেক দূর এগিয়ে গেছে। যে বাংলাদেশকে তারা দীর্ঘ ২৩ বছর নিজেদের স্বার্থে লাগিয়েছে, শোষণ করেছে, তাদেরই বিদায়ী লাথির উপহার হিসেবে সেই বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে পাকিস্তান থেকে ৫০ বছর পিছিয়ে পড়ল।

বেলসেন এবং অসউহজের পর গণহত্যার এমন জঘন্যতম ঘটনা আর ঘটেনি। অথচ বৃহৎ শক্তিবর্গ বাংলাদেশের ঘটনার ব্যাপারে উটপাখির নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। তারা যদি মনে করে থাকেন যে, এতদ্বারা তারা পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে সহায়তা করেছেন, তাহলে তারা ভুল করেছেন। কেননা পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান নিজেও মোহমুক্ত। তাদের বোঝা উচিত যে, পাকিস্তান আজ মৃত এবং ইয়াহিয়া নিজেই পাকিস্তানের হত্যাকারী। স্বাধীন বাংলাদেশ আজ একটা বাস্তব সত্য। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি অজেয় মনোবল ও সাহসের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে এবং প্রতিদিন হাজার হাজার বাঙালি সন্তান রক্ত দিয়ে এই নতুন শিশু রাষ্ট্রকে লালিত পালিত করছেন। দুনিয়ার কোনো জাতি এ নতুন শক্তিকে ধ্বংস করতে পারবে না। আজ হোক কাল হোক দুনিয়ার ছোট বড় প্রতিটি রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হবে এ নতুন জাতিকে। স্থান দিতে হবে বিশ্ব রাষ্ট্রপুঞ্জে।

সুতরাং রাজনীতি এবং মানবতার স্বার্থেই আজ বৃহৎ শক্তিবর্গের উচিত ইয়াহিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করা, তার লাইসেন্সধারী হত্যাকারীদের খাঁচায় আবদ্ধ করা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করা। আমাদের সংগ্রামকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ যে সমর্থন দিয়েছেন তা আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবো। গণচীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, গ্রেট বিটেন ও অন্যান্য দেশের কাছ থেকেও আমরা অনুরূপ সমর্থন আশা করি এবং তা পেলে সেজন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানাব। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের উচিত তাদের নিজ নিজ পর্যায়ে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করা এবং তারা যদি তা করেন তাহলে ইয়াহিয়ার পক্ষে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আর একদিনও হামলা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়।

জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ হলো বিশ্বের অষ্টম বৃহৎ রাষ্ট্র। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে ইয়াহিয়ার সৃষ্ট ভস্ম ও ধ্বংসস্তূপের উপর একটা নতুন দেশ গড়ে তোলা। এ একটা দুরূহ ও বিরাট দায়িত্ব। কেননা আগে থেকেই আমরা বিশ্বের দারিদ্রতম জাতিসমূহের অন্যতম। এছাড়া একটা উজ্জ্বল

www.pathagar.com

ভবিষ্যতের জন্য মানুষ একটা ঐতিহাসিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তারা প্রাণপণে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তারা প্রাণ দিচ্ছে অকাতরে। সুতরাং তাদের আশা আমরা ব্যর্থ করতে পারি না। তাদের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতেই হবে।

আমার বিশ্বাস যে জাতি নিজে প্রাণ ও রক্ত দিতে পারে, এতো ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, সে জাতি তার দায়িত্ব সম্পাদনে বিফল হবে না। এ জাতির অটুট ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে কোনো বাধা বিপত্তি টিকতে পারে না।

আমাদের এই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে আমরা কামনা করি বিশ্বের প্রতিটি ছোট বড় জাতির বন্ধুত্ব। আমরা কোনো শক্তি, ব্লক বা সামরিক জোটভুক্ত হতে চাই না। আমরা আশা করি শুধু শুভেচ্ছার মনোভাব নিয়ে সবাই নিঃসংকোচে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। কারও তাবেদারে পরিণত হওয়ার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের দীর্ঘ সংগ্রামে আমাদের মানুষ এতো রক্ত দেয়নি, এতো ত্যাগ স্বীকার করছে না।

আমাদের এই জাতীয় সংগ্রামে তাই আমরা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং বৈষয়িক ও নৈতিক সমর্থনের জন্য বিশ্বের জাতিসমূহের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি। এ ব্যাপারে প্রতিটি দিনের বিলম্ব ডেকে আনছে সহস্র মানুষের অকাল মৃত্যু এবং বাংলাদেশের মূল সম্পদের বিরাট ধ্বংস। তাই বিশ্ববাসীর প্রতি আমাদের আবেদন আর কালবিলম্ব করবেন না। এ মুহূর্তে এগিয়ে আসুন এবং এতদ্বারা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের চিরন্তন বন্ধুত্ব অর্জন করুণ।

বিশ্ববাসীর কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম, বিশ্বের আর কোনো জাতি আমাদের চেয়ে স্বীকৃতির বেশি দাবিদার হতে পারে না। কেননা, আর কোনো জাতি আমাদের চেয়ে কঠোরতর সংগ্রাম করেনি, অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করেনি।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ নামে দেশ

The state is the Divine idea as it exists on earth.

—Hegel

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর, বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ৯১ হাজার ৫৪৯ জন পরাজিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পক্ষে ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লেঃ জেনারেল আমীর আব্দুলাহ খান নিয়াজী মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথ কমান্ডের প্রধান লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করলে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে।

বাংলাদেশ নামটি দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজেই। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা'ও তাঁরই নির্বাচিত। বাঙালি জাতির জন্যে একটি রঙিন দেশের স্বপ্ন যে তিনি কতোটা গভীরভাবে দেখেছিলেন তার জন্যে এর চেয়ে বড় আর কোনো প্রমাণের দরকার হয় না। আর এই স্বপ্ন পূরণের জন্যেই তিনি তাঁর ২৭ বছরের রাজনৈতিক জীবনে ১৩ বছর ৯ মাস কারাগারে ছিলেন।

এমন অজস্র ঘটনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে মুজিব নামের মহিমা। তাঁকে বুঝতে হলে অঙ্কের মতো সমালোচনা নয় হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। তাঁর সম্পর্কে বলতে ইচ্ছে হয়—

'মরবি যদি জিন্দা মরা বাংলায় চলে আয়
আমার বঙ্গবন্ধু প্রেম আগুনে ওই মরা পোড়ায়'

তিনি তাঁর দেশ প্রেমের আগুনে বাংলা ও তার মানুষকে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে ছিলেন। আর এই জন্যই ২১৪ বছর পর আবার আমাদের পক্ষে স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

www.pathagar.com

They Were Defeated By Themselves

In 1971, what happened was hot only the consequences of that years or years very nearest to the past. It was the consequences of a long time politically as well as technically failure Pak regime where a combination of military and civil regime. The failure started since 1948 and lasted to the 16th December. Nothing else. They were defeated by themselves straightly. I can clear the whole issue.

In 1948, Jinnah declared the debated language issue. It were the Pakistani leaders who wanted to show the unity of Pakistan through one national language was there any problem if there are two definitional languages! No problem. Ultimately, if happened in 1954, Bengali became one the state languages. But it was too late to heal the sore created by the burguoise movement. We cannot deny the ultimate effect of the history.In 1954, the United Front government was formed in Bangladesh. It was the reflection of the demand of the Bengali mass people. But the Pak politicians failed to understand the gravity of the situation. They made the situation more critical by playing games with this newly formed govt. Mujib understand what he should do. He asides himself and devoted to the politics. The rift of the valey became larger. The distance grew more and more.

In 1958, General Ayub Khan became the second President of the Pakistan; all the political issues were nothing but eye wash. He made mistakes one after another. His basic democracy was nothing but a deception. His style of domination was none but the oppression over the majority of the country. He plotted aggressive conspiracy case and failed to fulfill his goal. He also formed "Democracy Activation committee". But it was too late to hold the situation. Leaders from both part were become totally fade up on him and he failed to reach any goal. Bhuttorose as the sole political figure inWest Pakistan. At last Ayub Khan transferred the power to the General Yahya.

Yahya is the first person who at last tried to consider the issue of participation of Bangladeshi polititicians. His course of action at least proved that though his technique was full of inconsistencies but at

www.pathagar.com

least he tried to do something. His abolition of one unit, Legal Framework Order, one person one vote policy nothing worked. I still do not know why he declared election where he absolutely know that Bengalis are the majority and they will form the Govt. Was he tried to save the centre by taking equal representatives from both sides as forming provincial governments or whether he thought that Awami League would achieve majority. All his efforts were thrown in to astray. Mujib became harsh and Bhutto managed the situation as per his desire. He wanted to be the prime Minister. If it is not whole Pakistan, it did not matter for him. A West Pakistan was enough for him. He just wanted to be a sovereign prime Minister with sovreign Power. He had no time to think about East Pakistan and the issue of Mujib. He was humisical to his goal.

Yahya continued but he knew that failure is the ending. Long distance, gap of communication, weather of our country, myths and reality related to India were some of various factors they considered. But nothing to do. They became ousted in only one weak from the beginning of all out attack. If we consider 4th December as the starting date of the all out war, on 8th December Niaji was called by the Governor for explanation. But there was nothing to describe. Pak army failed. They were helpless due to the success of others and also by some situations of which some were created by themselves and some were natural.

We always try to discuss this sensitive issue from one single corner. But there were so many factors involved with this war. None can avoid them. Every leader thought the war from his angel. But the situation was a collective one. Many a civilian attend the war to free their country from opponent. But they never think that what they achieved through the war. Many a politician attended the war through official means but they were became the ultimate leader. Satisfaction arose from various means.

The whole situation was nothing but a chaotic one. Pak army surrendered to the Indian Army. It seemed that they were our new master rather than our helper. All the Pak rulers were engaged on the

www.pathagar.com

issue of West Pakistan as well as their political career. But the people of Bangladesh waited by long years to be evaluated, to be asked and also to participate. But they have not time to consider these trifle things.

So, Bangladesh roared and became an independent nation. The war was the way of our victory. After the Second World War we were the only nation who achieved their freedom through this way. Long live Bangladesh.

www.pathagar.com

শেখ মুজিব অধ্যায়

পঞ্চান্ন বর্ষায় ভেজা মুজিবের পঞ্চান্ন বছরের জীবনে পঞ্চান্নটি বসন্তও যে ছিলো তা কিন্তু মিথ্যে নয়। ২০ বারেরও বেশি কারাবাসের জীবনে ১২ বছরেরও বেশি সময় কেটেছিলো কারাগারের অন্তরালে। টুঙ্গীপাড়ার ধুলো কাদা মাখা দীর্ঘকায় মানুষটি জীবনে হেরেছেন অনেকবার কিন্তু তাই বলে কখনও নত হননি। যে বাংলার জল, হাওয়া, কাঁদায় তার বেড়ে ওঠা সেই বাংলাকে তার চেয়ে বেশি ভালবাসতে আর কেউ পেরেছে কি-না তা আমার জানা নেই। আর এ জন্যেই হয়তো তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালির জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মুজিবকে আমি দেখিনি। দেখার কথাও নয়। আমার শৈশবেই তিনি গত হন। পৃথিবীর কোনো কিছুই বোঝার মতো বয়স তখন আমার হয়নি। কিন্তু বড় হয়ে তাঁকে যতোটা জেনেছি বা জানতে ইচ্ছে করেছে অতোটা আর কারও ক্ষেত্রে হয়নি। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় কোনো মানুষ তার দেশকে এতোটা ভালোবাসতে পারে। দেশপ্রেমের আরেক নাম শেখ মুজিব।

বাঙালির লাঞ্ছনার অনেক ঘটনা আছে। রাজাকারের দায়ভার বহনের লাঞ্ছনা, লুট-তরাজের রাজনীতির লাঞ্ছনা, অবিচার, অনাচার, অনিয়মের লাঞ্ছনা, ঘুষ-দুর্নীতির লাঞ্ছনা, অশিক্ষা আর অপুষ্টির লাঞ্ছনা সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা আমরা জাতির পিতার হন্তারক। পিতার রক্তে রঞ্জিত আমাদের হস্ত, পদ, আপাদমস্তক। ইতিহাস নিয়ে, তার সাল তারিখ নিয়ে, জটিল আবর্ত নিয়ে অনেক ধুন্ধুমার কিচ্ছা কাহিনী, তুলকালাম ঘটনা, তুমুল লেখালেখি আর বক্তৃতার অভাব নেই।

আমিও মাঝে মাঝে চেষ্টা করি কলমের কারিকুরিতে মস্তিস্কের জটিল খেলায় অসামান্য কারিশমা দেখানোর। কিন্তু জীবনের সর্বত্র যে কারিকুরি চলে না তা বেশ বোঝা যায়। যখন আমরা আমাদের আবেগের জয়গাগুলোতে হাত দেই। সন্তানের প্রতি পিতার আদরের তাই যেন ব্যাকরণগত কোনো সংজ্ঞা নেই। সে তার সন্তানকে কখনো মাথায় তোলে, ঘাড়ে বসায়, কখনো কোলে

www.pathagar.com

নেয়, আবার কখনো পায়ের উপর শুইয়ে দোল খাওয়াতে খাওয়াতে ঘুম পাড়ানি গান শুনায়। এসব একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ আর অনুভূতির খেলা । মুজিবের প্রতি আমার ভালোবাসা এরকমই একটি খেলার নামান্তর। আমি মুজিব নামের পাগল। ভাষা তাই ভালোবাসার কাছে অসহায়, প্রকাশের অপর সংজ্ঞা।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালো রাত্রিতে পিতার প্রস্থান হয়। কে কোন উদ্দেশ্যে সেদিন এমন বিয়োগান্তক ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেছিল তা নিয়ে বিগত ৪৫ বছরে কম জল্পনা, কল্পনা, গবেষণা হয়নি। কিন্তু সত্যিকার অর্থে যা দাঁড়িয়েছে তার অর্থ ঐ একটাই—আমরা পিতাকে হারিয়েছি। নিঃস্ব জাতির সামনে আজও অজস্র অন্ধকার হিংস্র থাবা মেলে ছুটে আসতে চায়। আমরা সবই বুঝি। কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। সে দিন সমস্ত নিষ্ঠুরতা একাই তিনি তার বুকে ধারণ করেছিলেন। আজ আর এমন কেউই নেই যিনি মুজিব হওয়াতো দূরে থাক অন্তত তার ছায়াটুকু হবে।

মুজিব বার বার আসে না। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চে যার জন্ম, মধুমতি আর বাইগার নদী অধ্যুষিত টুঙ্গিপাড়ার বাতাসে আজও তার শরীরের সুগন্ধ। পত্র পল্লবের মর্মরে আজও তার কণ্ঠের ধ্বনি যেন বারে বারে কেঁদে কেঁদে বেজে ওঠে। বাংলার আকাশে বাতাসে আজও সে মেঘেদের কানাকানি। সকালের সূর্যের কাঁচা সোনা রোদের ঝিলিক। বিকালের রক্তিমাভ লাল আভার সর্বত্রই যেন মুজিবের ছোঁয়া। কোন মানুষ তার দেশ মাটি আর মানুষের সাথে এতোটা মিশে যেতে পারে তা অনুভব না করলে বোঝা সম্ভব নয়। মুজিবকে যাদের চোখে পড়ে না তারা বাংলাকেও দেখেও না। আর যারা বাংলাকে দেখে না তারা কী বাঙালি? ইতিহাস এখনই আমাদেরকে বার বার প্রশ্নবিদ্ধ করে - আমরা তাহলে কী? মানুষরূপী অন্য কিছু? ভাবতেও অবাক লাগে এতো কিছুর পরও আমাদের লজ্জা হয় না। পিতার রক্তে রঞ্জিত হাতে আমরা দু হাত ভরে লুটপাট চালাই। বড় বড় কথা বলি। বিবেক তখন কোথায় থাকে।

নানান মত, নামান পথে আজ আমরা বহুধা বিভক্ত । এত্তো পথ নিশ্চয়ই সঠিক গন্তব্যে যায়নি। সঠিক গন্তব্যের পথ একটাই। তা হলো ঐক্যের পথ, সাম্যের পথ, সম্প্রীতির পথ। মুজিব ছিলেন সেই পথের ধারক ও বাহক। শত্রুরা তাই তাকে ভয় পেতো। তারা জানত মুজিব সঠিক পথে আছে। জয় তারই হবে। কোলকাতার দাঙ্গার সময় তিনি সেখানে ছিলেন। তার পর পূর্ব পাকিস্তানে চলে এলেন। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের জন্ম হলো। মুজিবের রাজনৈতিক জীবন নতুন মোড় নিলো'। ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের

www.pathagar.com

সময় জেলে ছিলেন। তবুও দেখা গেলো সক্রিয়। ভাষার দাবিতে ১৩ দিন অনশন করার পর ২৬শে ফেব্রুয়ারি তিনি জেল থেকে মুক্ত হন।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই আওয়ামীলীগের সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হন। ঐ বছরের ১৪ই নভেম্বর সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্যে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩ টি আসনই ছিলো আওয়ামীলীগের। ১৫ই মে তিনি যুক্ত ফ্রন্ট সভার কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হন। কিন্তু ২১শে মে সরকার যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দেয়। ২৩শে মে করাচী থেকে ঢাকায় ফেরার পরে বিমানবন্দরে আটক হন। আবারও আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। আর এর সংগেই ১৭ই জুন পল্টন ময়দানে ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবি পেশ করা হয় । এখানেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়তশাসনের দাবি পেশ করা হয়। ২৬ শে আগস্ট পাকিস্তানের প্রাদেশিক গণ পরিষদের অধিবেশনে শেখ মুজিব বলেন—

"Sir [President of the Constituent Assembly], you will see that they want to palace the word "East Pakistan" instead of "East Bangal." We had demanded so may times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word "Bengal" has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been concerned. So far as the question of one unit is concerned it can come in constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? We will be prepared to consider one-unit with all these things. So I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form referendum of in the form of plebiscite."

১৯৬১ সালে গঠন করেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ। ১৯৬৪ সালে গঠন করেন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ। মাঝ খানে ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন। ১৯৬৬ সালে তিনি ঐতিহাসিক ছয় দফা পেশ করেন ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন। ১৯৬৯ সালে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের ১১ দফা দাবি পেশ করে। এতে পূর্বের সকল মামলা তুলে নিতে বলা হয়। ঐ বছরের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের এক সভায় বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন। ১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি ঘোষণা করেন "একটা সময় ছিল যখন এই মাটি আর মানচিত্র থেকে "বাংলা" শব্দটি মুছে ফেলার সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। "বাংলা" শব্দটির অস্তিত্ব শুধু বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না। আমি

www.pathagar.com

পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আজ ঘোষণা করছি যে, এখন থেকে এই দেশকে 'পূর্ব পাকিস্তানের' বদলে বাংলা বলে ডাকা হবে।"

মূলত এখান থেকেই বাংলাদেশের বীজ রোপিত হয়। তার পর আসে ১৯৭০ এর নির্বাচন । নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে আওয়ামীলীগ দেশকে আস্তে আস্তে স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। রাজনীতির অমর কবি শেখ মুজিবের লেখা কাব্য কোনো একটা সাধারণ কাগজে ছাপানো নয়। তার লেখা মহাকাব্যের নাম বাংলাদেশ। তিনি যে মহাকাব্য রচনা করে গেছেন তা আর সব মহাকাব্যের মতো থেমে নেই । প্রতি দিনই নতুন নতুন ফুলে ফলে, ডাল পালায় বিকশিত হচ্ছে। মুজিব তাই প্রতিদিনই স্মরণীয় । আমাদের অন্তরও তাই বার বার বলে ওঠে– পিতা তোমায় সালাম।

www.pathagar.com

আবারও রক্তাক্ত হলাম

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোররাতে তৎকালীন সামরিক বাহিনীর একটি প্রতিক্রিয়াশীল দল তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারবর্গকে হত্যার জন্য হামলা চালায়। একটি দল ট্যাংক সহযোগে শেখ মুজিবের ৩২নং ধানমণ্ডির বাড়িতে হামলা চালিয়ে শেখ মুজিবকে সিঁড়ির উপর হত্যা করে। অন্য দুটি দলের একটি শেখ মুজিবের ভাগ্নেয় এবং তৎকালীন প্রথিতযশা আওয়ামীলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মনির বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করে। অন্য দলটি মুজিবের ভগ্নিপতি এবং তার সরকারের মন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাত এর বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করে। ধারণা করা হয় তৎকালীন সর্ব মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান, আব্দুর রশিদ, শরফুল হক (ডালিম), মহিউদ্দিন আহমদ এবং একে এম মহিউদ্দিন আহমদ প্রমুখসহ আরও অনেকে এই যড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিল। যদিও কোনো কোনো মহল মনে করে ষড়যন্ত্র কারীদের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএর হাত ছিলো। তৎকালীন ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন বুস্টার এর কার্যকলাপ এ রকম সন্দেহের উদ্রেক করে।

শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর তার খুনীদের বাঁচাতে জিয়াউর রহমানের আমলে 'ইনডেমনিটি এ্যাক্ট' নামে একটি বিশেষ আইন পাস করা হয় এবং ঐ সব আত্মস্বীকৃত খুনীদের লিবিয়া, চীন, কানাডা, জিম্বাবুয়ে ইত্যাদি দেশের বাংলাদেশী মিশনে বিভিন্ন পদ প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে সৈয়দ ফারুক রহমান ১৯৮৫ সালে এরশাদের শাসনামলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাংলাদেশ ফ্রিডম পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে এরশাদের আমলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা প্রথম বারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলে শেখ মুজিব হত্যার বিচার শুরু হয়। ১৯৯৮ সালে প্রদত্ত রায়ে সৈয়দ ফারুক রহমান ও আরও ১৪ জনকে অভিযুক্ত করে মৃত্যুদণ্ডাদেশ

www.pathagar.com

দেওয়া হয়। পরবর্তীতে উচ্চ আদালতের রায়ে এদের মধ্যে থেকে ৩ জনকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে গ্রেফতারকৃত পাঁচজন সৈয়দ ফারুক রহমান, মহিউদ্দিন আহমদ, বজলুল হুদা, শাহরিয়ার রশিদ খান এবং একেএম মহিউদ্দিন আহমদ এর ফাঁসি ২০১০ সালের ২৮শে জানুয়ারি ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে কার্যকর করা হয়। বাকি সাতজন এখনও বিদেশে পলাতক রয়েছে। অবশ্য সরকার তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসির রায় কার্যকর করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

শেখ মুজিব হত্যা পরবর্তী অধ্যায়

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট গভীর রাতে সেনাবাহিনীর কিছু বিপদগামী সেনা কর্মকর্তারা রাষ্ট্রপতির বাসভবনে হামলা চালালো এবং তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত কর্মচারী ও পরিবারবর্গকে নৃশংসভাবে হত্যা করলো। শুধু তাঁর কন্যাদ্বয় শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ও শেখ রেহানা পশ্চিম জার্মানীতে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই দুই কন্যা ব্যতীত সবাই ঐদিন নিহত হয়েছিলেন এবং এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সহকর্মী এবং আওয়ামী লীগের সহকর্মী খন্দকার মোস্তাক আহমেদ। ধারণা করা হয়েছিলো যুক্তরাষ্ট্রের CIA (Central Intelligence Agency) এই চক্রান্তে জড়িত। লরেন্স লিফসচুল্টস, অভিযোগ করেছিল যে, CIA এই গুপ্তহত্যার সাথে জড়িত। এবং তাঁর ধারণার উপর ভিত্তি করে ঢাকায় আমেরিকান অ্যাম্বাসেডর তখন বাতিল করা হয়েছিল। শেখ মুজিবের মৃত্যুও পরে বাংলাদেশের রাজনীতি টলমলে অবস্থায় ছিলো। ১৯৭৭ সালে সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করলেন ১৯৭৮ সালে। তিনি জরুরি অধ্যাদেশে স্বাক্ষর করলেন। এবং শেখ মুজিবের গুপ্তহত্যার সমস্ত কিছুই এখানে সমাপ্ত ঘটানো হলো।

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমানের শাসনামল (১৯৭৫-৮১)

সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জিয়াউর রহমান "জিয়া" ছিলেন একজন সাহসী ব্যক্তি। তিনি নাগরিক সরকার প্রধান গঠন করলেন। এবং তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ছিলেন বিচারপতি সায়েম। জিয়ার আদেশে বিচারপতি সায়েম সংসদ ভেঙ্গে পুনরায় গঠন করলেন ১৯৭৭ সালে নির্বাচন ও আইন অনুযায়ী। জিয়াউর রহমান Martial Law Administration (MLA) আইন অনুযায়ী সরকার পরিচালনা করতেন। জিয়া প্রথমে যে কাজটির উপর জোর দিয়ে দেশ চালনা করতে লাগলেন তাহলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এবং তিনি জোর দিতে লাগলেন পরিবার পরিকল্পনার উপরে। নভেম্বর ১৯৭৬ সালে জিয়া হলেন (Chief Martial Law Administration) এবং তিনি তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনার ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রধান বিচারপতি সায়েম এর অবসর গ্রহণের পাঁচ মাস পরে জাতীয় নির্বাচন করেন ১৯৭৮ সালে।

রাষ্ট্রপতি অনুযায়ী জিয়া ঘোষণা করলেন ১৯ দফা নির্বাচনী ইশতেহার যাতে বলা হয়েছিলো অর্থনৈতিক অবস্থা পুনর্গঠন। জিয়া ১৯৭৮ সালের নির্বাচনে জয়ী হলেন ৭৬% ভোট পেয়ে। এবং তিনি সংসদীয় নির্বাচন করলেন ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে। এই নির্বাচনে ৩০টিরও বেশি দল অংশগ্রহণ করলেন। জিয়া বাংলাদেশের নতুন সরকার গঠন করলেন। এবং গঠন করলেন Bangladesh Nationalist Party (BNP), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নামে পরিচিত।

১৯৮১ সালে জিয়াকে গুপ্তহত্যা করা হলো চিটাগাং-এ এবং এ হত্যা করলেন বকিছু সেনাবাহিনীর সদস্যরা। সেই সময়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ছয় মাসের মধ্যে জরুরিভাবে নির্বাচনের ঘোষণা করলেন। বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বিএনপির প্রার্থী হয়ে এই নির্বাচনে জয়লাভ করলেন।

www.pathagar.com

এরশাদ আমল (১৯৮২-৯০)

১৯৮৬ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয় সাথে ছিলেন প্রধান বিচারপতি এবং সেনাবাহিনীর সেক্রেটারি (১৯৮৪-১৯৮৯) ব্রিগেডিয়ার এ বি এম ইলিয়াস। সেনাবাহিনীর প্রধান লেফট্যানেন্ট জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ। তিনি মূলত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করেন। এরশাদ তাঁর আমলে যে কাজটি করেন তাহলো, অধিকাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সরকারি করা। তাঁর সময়ে ৭০% এর বেশি শিল্পকারখানা ছিলো সরকারি। তিনি শিল্পকারখানাগুলো ব্যক্তিগত বিনিয়োগে সাহস যোগাতেন। বিদেশি কোম্পানিগুলোকে আমন্ত্রণ জানাতেন দেশি কোম্পানিগুলোতে বিনিয়োগ করতে। হুসেইন মোঃ এরশাদ দুর্নীতির বিরুদ্ধেও কঠোর আন্দোলন করেছেন। তাঁর সময়ে দেশ ইতিবাচকভাবে উন্নতি লাভ করেছিল। বাংলাদেশ তখন এমন একটি দেশ ছিলো যা চরম আর্থিক সংকটের মুখোমুখি ছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমান ঘোষণা করলেন যে, দেশ গুরুত্বপূর্ণভাবে খাদ্য সংকটের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। সরকার ৪ বিলিয়ন টাকার বাজেট ঘাটতি ছিল এবং IMF (International Monetary Fund) ঘোষণা দিলেন যে তারা বাংলাদেশকে কোনো ঋণ দেবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশ তাঁদের পূর্বের ঋণ শোধ না করে। এই পরিস্থিতিতে এরশাদ দেশ পরিচালনার জন্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এবং এরশাদ এই সময়ে জাতীয় পার্টি গঠন করেন। যদিও এই সময়ে বিএনপি'র নেতা বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচন বয়কট করেছিলেন। সেই সময় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালের মে মাসে। জাতীয় পার্টি এই নির্বাচনে জয়লাভ করেন। তারা ৩০০টি আসনের মধ্যে অধিকাংশ আসনে জয়লাভ করেন। মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদ অনিয়মিতভাবে কিছু সংখ্যক ভোট পায়। এই নির্বাচনের পর এরশাদ সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

হুসেইন মোঃ এরশাদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নূর হোসেন মৃত্যু বরণ করেন। যাই হোক, এরশাদ সংসদীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন নির্বাচন করেন ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে। এই নির্বাচনে এরশাদ বিজয় লাভ করেন। ৩০০টি আসনের বিপরীতে জাতীয় পার্টি ২৫১টি আসন পেয়ে এই নির্বাচনে জয়লাভ করে। এই নির্বাচনের ফলে ১৯৮৯ সালে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিলো। ১৯৯০ সালে দেশের

www.pathagar.com

বিরোধী দলের লোক জনসাধারণ আন্দোলন জানাতে লাগলেন এরশাদের নিয়মনীতির বিরুদ্ধে।

দেশের শহর এলাকার উন্নতির জন্য এরশাদ উপজেলা ও জেলা পরিষদ চালু করেন। হুসেইন মোঃ এরশাদ সর্বপ্রথম গ্রাম্য ভোটের ব্যবস্থা চালু করেন ১৯৮৫ সালে।

গণতন্ত্রে উত্তরণ

এরশাদের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো জোরালো আন্দোলন শুরু করলো। জিয়ার বিধবা স্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি, মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা এবং জামাত-ই-ইসলাম এই দলগুলো ছিলো এরশাদের বিরুদ্ধে। তারা অবরোধ ডাকলো ও অর্থনৈতিক অবস্থা অচল করে দেয়ার হুকমি দিলেন। যদিও সংসদীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হলো তবুও বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বয়কট করলেন। প্রায় দুমাস ধরে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো সাধারণ জনগণের মধ্যে। অবশেষে ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে এরশাদ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেন। অবশেষে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ মনে করলেন জাতি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত এবং তিনি একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করলেন।

খালেদা জিয়ার শাসনামল (১৯৯১-১৯৯৬)

কেন্দ্রীয় নির্বাচনে বিএনপি গণতান্ত্রিকভাবে জয়লাভ করলেন এবং সরকার গঠন করলেন খালেদা জিয়া ইসলামি দল জামাত-ই-ইসলাম এর সাথে। শুধু চারটি দল এর ১০ জন সদস্য এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলো। বিএনপি থেকে খালেদা জিয়া, আওয়ামী লীগ থেকে শেখ হাসিনা, জামাত-ই-ইসলাম থেকে গোলাম আযম এবং জাতীয় পার্টি থেকে দলের কার্যকরী চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী। যদিও দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এরশাদ, তখন তিনি দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ছিলেন। ১৯৯১ সালের অক্টোবরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন আব্দুর রহমান বিশ্বাস। যাই হোক, মার্চ ১৯৯৪ সালে বিরোধী দল দাবি করেছিলো যে, দেশ চালাতে অক্ষম। তৎকালীন সময়ে বিরোধী দল সংসদে প্রবেশ বয়কট করলেন। বিরোধী দল দাবি জানালো যে, জিয়া সরকার যেন পদত্যাগ করে। এ দাবিতে তারা অবরোধ শুরু

www.pathagar.com

করলো। ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বয়কট করলো শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ।

ফেব্রুয়ারির এই নির্বাচনে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি পুনরায় জয়লাভ করলো। তখন প্রধান বিচারপতি ছিলেন মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান। সেই সাথে তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা। ১৯৯৬ সালের জুন মাসে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো এবং শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করলো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হলেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় জাতীয় পার্টির সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করলো।

www.pathagar.com

নেতৃত্বের নতুন সংজ্ঞা জননেত্রী শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এর কন্যা। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভক্তির সময় তাঁর জন্ম। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাক বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন তখন শেখ হাসিনা তাঁর দাদীর কাছে ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট যখন তার পরিবারের সদস্যদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় তখন তিনি দেশে ছিলেন না। তিনি এবং তাঁর একমাত্র বোন ছিলেন পশ্চিম জার্মানিতে। সে ততক্ষণ দেশে ফিরলেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আওয়ামীলীগ-এর নেতা নির্বাচিত হলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের ১৭ই মে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।

১৭ই মে ১৯৮১। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। জাতি তখনই খুব কঠিন সময় পার করছে। এর মাত্র কিছুদিন পরেই দেশ ও জাতির ভালোবাসায় ধন্য সামরিক শাসক থেকে পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি হওয়ার চেষ্টারত জেনারেল জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে নিহত হন। তারিখটি ছিল ৩০শে মে ১৯৮১। জাতির সামনে আরও দুর্যোগময় দিন এসে হাজির হলো। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলো যখন ২রা জুন ১৯৮১ অর্থাৎ জিয়াউর রহমান হত্যার মাত্র চার দিনের মাথায় তার ঘাতক নিহত হন। নিহত হওয়ার সময় তাকে পুলিশের অধীন থেকে সেনাবাহিনীর অধীনে স্থানান্তর করা হচ্ছিল। সম্ভবত জেনারেল এরশাদ বিষয়টিকে প্রভাবিত করেছিলেন।

আসলে ঘটনাগুলো খুব দ্রুত প্রবাহিত হচ্ছিল। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো একটি সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের জন্যে ব্যাপারগুলো মোটেই

www.pathagar.com

মঙ্গলজনক ছিলো না। ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রটি ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট তার স্বপ্নদ্রষ্টাকে হারালো। আর সেখান থেকেই পথ হারানো খেলার শুরু। বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু যেখানে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন জাতি সেখানে ক্রমবিভক্তির পথ বেছে নিলো।

ক্ষমতালোভী খন্দকার মোশতাক ক্ষমতায় বসলেন ঠিকই কিন্তু আখেরে তেমন কোনো ফায়দা হলো না। মাত্র ৩ মাস যেতে না যেতেই খোলস ভেঙ্গে সত্যিকারের মুখোশধারীরা বেরিয়ে এলো । ৬ই নভেম্বর ১৯৭৫-এ তাকে সরে দাঁড়াতে হলো। ক্ষমতায় এলেন আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম। কিন্তু এর সবই ছিলো গতানুগতিক। লোক দেখানো। কলকাঠি নাড়ছিলো অন্য কেউ। ২১ শে এপ্রিল ১৯৭৭-এ জিয়ার হাতে ক্ষমতা দিয়ে পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। তারপর জিয়া অধ্যায়। নতুন তত্ত্ব। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী, ঐতিহাসিক উনিশ দফা, খাল খনন কর্মসূচি। সব মিলিয়ে বাঙালি যেন এক মহা উৎসবে মেতে উঠল। ভাবতেও অবাক লাগে মাত্র ৫ বছরের মাথায় একটি জাতি তার স্বাধীনতার মূলতত্ত্ব ভুলে গিয়ে অন্য এক মোহে নিমজ্জিত হলো।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামীলীগের পাশাপাশি বিএনপি নামক একটি দল দাঁড়িয়ে গেলো যারা স্বাধীনতার আদর্শকে ক্রমে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুললো তাদের কথা ও কার্যকলাপের মাধ্যমে। জাতির জনকের হাত্যাকারীদের বিচারে প্রতিকূলতা সৃষ্টিকারী আইন পাসের পাশাপাশি তাদের পুনর্বাসনসহ আরও অনেক কার্যকলাপ যা জনগণের কাছে আকর্ষণীয় করে দেখানো হয়েছিল মূলত সে সব ছিলো ইতিহাসের প্রকৃত গতিপথ থেকে জাতিকে অন্য ধারায় প্রবাহিত করার অপচেষ্টা মাত্র।

সকল আকর্ষণীয় জিনিসই যে সবসময় ভালো ফল বয়ে আনে না ইতিহাসে তার হাজারো প্রমাণ আছে। বাংলাদেশের মানুষও সেদিন সেই ধোঁকায় পড়েছিল কিন্তু তা বুঝে উঠতে তাদের অনেক সময় লেগেছিল। কিংবা তারা হয়তো ইচ্ছে করেই বুঝতে চাইছিলো না কারণ দেশ গড়ার মতো মহান কাজের চাইতে সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী লুটেপুটে খেয়ে যদি সাময়িকভাবে হলেও ভালো থাকার উপায় হয় তাহলে এতোটা ভাবার আর কি আছে। আর সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য কেউ যদি আকর্ষণীয় প্লাটফর্ম তৈরি করে দেয় তাহলে তো সেটা আরো লোভনীয়।

www.pathagar.com

বাস্তবেও তাই ঘটেছিল। ঘাপটি মেরে থাকা ছদ্মবেশী দেশ প্রেমিক লুটেরা মুজিবের শাসন আমলেও কম সক্রিয় ছিলো না। আর এই জন্যেই মুজিবকে খোল নলচে বদলানোর জন্য বাকশাল গঠন করতে হয়েছিলো। সামরিক বাহিনির পাশাপাশি রক্ষী বাহিনি গঠন করতে হয়েছিল। বাঙালির জন্যে এ সব সত্যিই লজ্জার।

কিন্তু ইতিহাস এখানেই থেমে থাকেনি। যথেষ্ট সময় গড়িয়েছে। শকুন তার নগ্ন থাবা মেলে দেশের মানচিত্রকে খুবলে খেয়েছে। আর এর সামান্য ছিটে ফোঁটা ও অবশিষ্টাংশের ভাগ নিয়ে আমরাও যেন বর্তে গেছি। রাজনীতির কুশীলবদের থেকে শুরু করে আমলারা, ব্যবসায়ী সামাজ থেকে সাধারণ মানুষ কেউই এর বাইরে নই। পাপের গ্লানি আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে । এখন অনেকেই আমারা বুড়ো ভাম সেজে বসে আছি। ভাবখানা এমন যেন কিছুই জানি না। আসলে সবই জানি। কারণ এ সব আমাদের দু হাতের কামাই, পাপের ফসল, জাতিকে ধ্বংসের তলানীতে নিয়া যাওয়া হয়েছিল। ধোঁকার পরে ধোঁকা আদর্শ আর চেতনাকে মাটি চাপা দিয়ে দিল। অবশ্যই এখন সময় বদলে গেছে। তবে তা কি এমনি এমনি। মোটেই না। এর পিছনে কারও না কারও হাত আছে।

শেখ হাসিনা প্রথম বিরোধী দলীয় নেত্রী হন ২০ শে মার্চ ১৯৯১। নব্বইয়ের উত্তাল গণ আন্দোলনের পর যে সরকার গঠন হয় তাতে মোট ভোটের হিসাবে আওয়ামীলীগ প্রায় ৫ লাখ ভোট বেশি পেলেও আসন সংখ্যায় হেরে যায়। বিএনপি জামায়াত জোটের কাছে। কিন্তু বিরোধী নেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা তার দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন। দেশ ও দশের উত্তরণের ফলশ্রুতিতেই ১৯৯৬ সালের ২৩ শে জুন প্রথম বারের মত প্রধানমন্ত্রী হন। ক্ষমতায় ছিলেন ১৫ই জুলাই ২০০১ পর্যন্ত। অনেক কাজ হয়েছিল। যতোটা পেরেছেন চেষ্টা করেছেন। সব কিছু কাটিয়ে উঠে দেশকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড় করানো। কিন্তু পুরোপরি শেষ রক্ষা হয়নি। নির্বাচনে হেরে যান বিএনপি জোটের কাছে। আবারও বিরোধী দলীয় নেত্রী। ১০ই অক্টোবর ২০০১ থেকে ২৯ শে অক্টোবর ২০০৬ পর্যন্ত।

তারপর একেবারেই ওলটপালট একটা সময়। রাজনীতির এই সব ক্রান্তিকালের কোনো সঠিক নামকরণ বা ব্যাখ্যা আছে কি-না আমার জানা নেই। তবে দুর্বোধ্য সেই সময় পেরিয়ে অবশেষে তিনিই আলোর মুখ দেখেন। ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় বসেন।

www.pathagar.com

এবার আর পিছনে ফিরে তাকানো নয়। সরাসরি মাঠে নেমে পড়েন। একের পর এক দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে থাকেন। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য মাত্রা অর্জিত হয়। অনেক জঞ্জাল পরিষ্কার করে নতুন সূর্যের ঝলকানিতে যেন দশ দিগন্তকে আলোকিত করে তোলেন। এরই ফলশ্রুতিতে ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়লাভ করে ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তৃতীয় বারের মতো প্রধান মন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন।

শেখ হাসিনার রাজনৈতিক অর্জন, মেধা, প্রজ্ঞা, নেতৃত্বের গুণাগুণ ইতিহাসের তারিখ দিয়ে বোঝা যাবে না। এটা বুঝতে হলে তার গৃহীত পদক্ষেপগুলো খেয়াল করতে হবে। লাইনচ্যুত জাতিকে সঠিক পথে চালিত করার পাশাপশি সঠিক চেতনা ও নতুনের ধারায় ফিরিয়ে আনা অতোটা সহজ ছিলো না। তাকে ঘষামাজা সাফ করে ঝকঝকে তকতকে করা চাট্টিখানি কথা নয়। এখন পালিশ করার কাজ চলছে। আগামী দিনে অবশ্যই পরিপুষ্ট হবে এসব অর্জনের মাহিমা।

www.pathagar.com

কেন এই মুখোমুখি অবস্থান

রাজনীতিতে বিরোধিতার পাশাপাশি সহনশীলতাও যে প্রয়োজনীয় একটা উপাদান তা রাজনীতিক মাত্রই স্বীকার করেন। নিতান্ত নোংরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী দলসমূহের ইতিহাস ঘাঁটলেও দেখা যাবে রাজনীতির মূল আদর্শগত বিষয়গুলোর প্রতি তারাও শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু নিতান্তই বাস্তবতার খাতিরে কিংবা অনেকটা দায়ে পড়েই তাদের বেছে নিতে হয় ভিন্ন পথ। বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে এসবের খুব একটা অমিল পাওয়া যাবে না। এটাই চেনা বাস্তবতা। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের জন্ম যে প্রেক্ষাপটে তার বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এর মাত্র কিছু দিন আগেই কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। অথচ জন্মের পরপরই আওয়ামীলীগ পাক নেতাদের চোখে ভিলেনে পরিণত হয়ে গেল। তারপর টানা পোড়নের ২৭ বছর। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে অবশেষে ১৯৭১ শুধু কথায় চিড়ে ভিজেনি। টানা নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। অত:পর স্বাধীনতা, ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫। ভুল বোঝাবুঝি, পাওয়া না পাওয়ার সমান্তরাল রশি টানাটানি। অবশেষে সেই রশি ছিঁড়ে গেল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে এসে। দানব তার খোলস থেকে বেরিয়ে ছোঁবল মারল। কেউ কেউ বলে এটা ইতিহাসেরই পরিণতি। আমি অত শত বুঝিনা। কাজটা মোটেও ভালো হয়নি। কারণ এরপরই নতুন ঠিকানা খোঁজার চেষ্টা। এত সহজে কি সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যায়। ব্যাপারটা সবচেয়ে ভালো বুঝেছিলেন জিয়াউর রহমান, তিনিও কম চেষ্টা করেননি। কিন্তু শেষমেশ মরে বাঁচলেন ১৯৮১ তে এসে। আরেকজন এসে জুটল। সামরিক শাসক তবে কিছু আলাদা দর্শনের। একই দার্শনিক। শুধু ঘ্রাণটা একটু আলাদা। আমরা বুঁদ হয়ে থাকলাম নয়টি বছর। তারপর নাড়ী ছেড়া টান। সবকিছু ছিঁড়ে তার পেটের মধ্যস্থিত শিশুর জন্ম হলো। ভালোই বলতে হবে। নির্বাচন হলো। কিন্তু চমক ছিলো তাতে। ঘুমিয়ে থাকা বিরুদ্ধবাদীরা নতুন ধারার সাথে যুক্ত হয়ে ঘরে তুলল সোনালি ফসল।

www.pathagar.com

১৯৯১-১৯৯৬ সাল। কিভাবে কাটল সবার জানা। সহনশীলতা তখনও ছিলো। তারপর জয়ী হলো মূলধারা। ১৯৯৭ থেকে ২০০১। অনেক পুরনো হিসেব জমে ছিলো হিসেবের খাতায়। ঐতিহ্যের জ্বালা অনেক। অনেক কিছু মাথায় রাখতে হয়। হিমসিম খেলেও কোনো মতে সামলে নিলো। কিন্তু আবারও ছন্দ পতন। ২০০১-এ আবার এ ক্ষমতায় তিন মতাবলম্বীরা। পুতুলের পিছনে নাকের সূক্ষ্ম কারিগর। সবাই জানে। তবুও চুপচাপ। মনে মনে অকে কিছু বয়। আওয়ামীলীগ আসলে যদি পরকালটাই যায়। কিন্তু সবই অমূলক। যা কিছু চলছিল তা চালানো মুসকিল। পাঁচ বছর ধর্ম কর্ম সব বাদ দিয়ে আখের গোছানোর চেষ্টা। রাজনীতির সরল সমীকরণ। কিন্তু পরিণতি ভালো হলো না। কারা যেন এসে বাঁধ সাধল। বলে দিল এসব করে না। পথ দেখো। তারপর আরো দুটো বছর। ঘরে ফেরা ২০০৯-এ। ২০১৪-তে আবারও আসলে রাখা। সবই প্রয়োজনের তাগিদে। বাংলাদেশ। ২০২১-এ নিয়ে যেতে হবে। নিয়ে যেতে হবে ২০৪১-এ। দুর্বৃত্তের দ্বারা তা সম্ভব নয়। অন্তহীন। চেষ্টা। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা তো আর বসে থাকে না। তারা চলে সেল মুখোমুখি অবস্থানে।

www.pathagar.com

৪৪ বছরের জ্বালা-পোড়া

১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ মূলত ছিল একটা গভীর আবেগ প্রবণ বিষয়। আবেগের কারণ ছিল বহুবিধ। মুজিব কেন্দ্রিক বাংলাদেশের রাজনীতি যতটা না সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালিত ছিল তার চেয়েও বেশি ছিল আবেগময়। মূলত ৬৬-এর পর বাংলার রাজনীতির পুরোটাই ছিল মুজিবময়। তার কারণও বহু। তারচেয়ে বড় কথা পৃথিবীর সব দেশেই যুগে যুগে যে সংগ্রাম বা পরিবর্তন এসেছে তার চারপাশের লোকগুলোর সাথে কেন্দ্রবিন্দুতে যারা ছিলো তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগ্যতা ও অবস্থানগত পার্থক্য ছিলো অনুল্লেখ্য। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে চিত্র ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। বরাবরের অযোগ্য ও অদূরদর্শী বাঙালি সবসময়ই ছিলো দর্শকের সারিতে। একা মুজিবই ছিলো মঞ্চে। মূলত ত্যাগ ও দেশপ্রেমের পাশাপাশি যোগ্যতার সমন্বয় একমাত্র মুজিবের ক্ষেত্রেই ঘটেছিলো। আর তাই তিনিই এ পর্যন্ত আমাদের একমাত্র মহানায়ক।

স্বাধীনতা যুদ্ধ মূলতঃ শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট । ২৪ বছর ধরে অনেক চড়াইউৎরাই পার করেছিল জাতি। মুজিবই রয়ে গেলেন কালের সাক্ষী বটবৃক্ষ হয়ে। তার কোনো যোগ্য সহকর্মী তৈরি হলো না। মুজিবকে তাই সমস্ত আবেগ কিংবা অভিযোগকে একাই ধারণ করতে হলো। মুজিব তা পেরেছিলেন। একটি অপরিণত কাঁচা আবেগের স্রোতকে গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া থেকেই বোঝা যায় মুজিব কতটা কুশলী ও কৌশলী ছিলেন। আমার কাছে মুজিবই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী। স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরেও অবাক লাগে তিনি কেমন করে এটা করেছিলেন। *মূলত তার বক্তৃতা যেমন তীব্র ছিলো তেমনি তার মৌনতাও ছিলো সমান শক্তিশালী।* মুজিব মানে বিপ্লব। মুজিব মানে প্রেরণা। মুজিব মানে স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার পর ৪৪ বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার দিন যতোগড়িয়েছে সময় এবং ঘটনা প্রবাহ বাঙালির আসল স্বরূপই প্রকাশিত করেছে। এই দীর্ঘ সময়ে বাঙালির জাতি সত্তার বিকাশ, রাজনীতির

www.pathagar.com

মেরুকরণ এবং আমাদের বদলে যাওয়ার ভুল সমীকরণ আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আমরা এখনও কোথায় পড়ে আছি। কতোটা কাঁচা আবেগ নিয়ে আমরা আজও পথ চলি। *কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে আবেগ দিয়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা যায় কিন্তু তাকে ধরে রাখতে দরকার আবেগহীন পরিকল্পনা।* শেখ হাসিনা ভীষণ চেঁচামেচি করেন এই সব বিষয় নিয়ে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। উন্নয়নে আর বিনির্মাণে প্রয়োজন ত্যাগ, ধৈর্য আর দেশপ্রেম। কার সময় আছে এসব নিয়ে ভাববার। শেখ হাসিনা ভাবে ভাবুক। আমাদের ভাবখানা এমন যে তার পিতা এ দেশ স্বাধীন করেছিলেন তাই তার একারই ঠেকা পড়েছে এসব নিয়ে ভাববার। আমরা তো এখানে মূলত এক আজব পরগাছা। আমাদের অতোসব না ভাবলেও চলবে।

৪৪ বছরে এই আমাদের অবস্থা। কিছুই বদলায়নি। শুধু পোশাকে আশাকে পরিবর্তন এসেছে। প্রযুক্তির সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। মাথা পিছু আয় বেড়েছে। রাস্তা ঘাট উন্নত হয়েছে। একবারও কি ভেবে দেখেছি আমাদের মানসিকাতা দিনে দিনে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। আমরা সন্ত্রাসীদের দোষদেই। অত্যন্ত ভালো কথা। কিন্তু আমাদের অবস্থাটাও একবার ভেবে দেখা উচিত। স্বার্থপর কীটপতঙ্গ আর সন্ত্রাসীদের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। আধুনিক সমাজের প্রাণহীন প্রাসাদে আজ কতিপয় বিবেকহীন মানুষ প্রতিনিয়ত ধ্বংসের খেলা খেলছি। আমাদের স্বার্থপরতা লজ্জারও অতীত। ভেবে দেখা উচিত আমরা মূলত কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি।

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট শেখ মুজীব প্রাণ দিলেন। দেশ স্বাধীন করার প্রতিদান আমরা তাকে হাতে-নাতে বুঝিয়ে দিলাম। মূলত এর চেয়ে ভালো আমরা আর কিইবা করতে পারতাম। একটা বেপরোয়া, স্বার্থপর জাতির কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না। যাবেই বা কেন? অনেক প্রত্যাশার স্বাধীনতা সবাইকে সমানভাবে লাভবান করতে পারেনি। এটা সম্ভবও নয় । কিন্তু এমনটা ভাবাই কি যৌক্তিক ছিলো না যে আমি আমার দায়িত্ববোধ থেকে দেশকে স্বাধীন করেছি। স্বপ্ন পূরণের জন্যে নয়। কিন্তু বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা ছিলো একটা কাঁচা আবেগ। ভাগ্য পরিবর্তনের হাতিয়ার। মনে পড়ে হুজুর (সা) এর সেই বাণী–"যারা যে উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে তাদের হিজরত সেই উদ্দেশ্যেই হয়েছে।" আমরা গাছ লাগালেই তার ফল খাওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লাগি। একবারও ভাবি না এই ফলে পশু-পাখিরও হক আছে।

১৯৭৫ থেকে ১৯৮১। ইতিহাস সবারই জানা। অনেক পটপরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু মূলত আমরা কিছুই শিখিনি। আমি না হয় স্বীকার করছি বঙ্গবন্ধু

www.pathagar.com

হাজারটা ভুল করেছিলেন। তার প্রতিদানও তিনি পেয়েছেন। তিনি তো বিদায় নিলেন। আমরা কি করলাম। একজন সামরিক শাসকের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেলো আর একজন সামরিক শাসকের হাতে। এভাবে পনেরটি বছর। অবশেষে শেখ হাসিনাকেই গণআন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তন আনতে হলো। মুজিবের মহাপ্রয়াণের ১৫ বছরের মাথায় তারই রক্ত আবারও আমাদের পতাকাকে সমুন্নত করলো। এসব লক্ষ্য করার মতো বিষয়।

আমি বলবো তাতেও যে খুব একটা লাভ হয়েছিল তা নয়। আসলে অভিভাবকহীন ভেঙ্গে যাওয়া সংসার কখনও আর আগের মতো জোড়া লাগে না। পিতা আগেই গত হয়েছিলো। বিরুদ্ধবাদীরা মূলধারার বিপরীতে বরাবরই ঐক্যবদ্ধ। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামীলীগ সুযোগ পেলেও এর পরপরই পরিবর্তন আমাদের পেয়ে বসলো। আবারও সেই ঊষর মরুভূমির তপ্ত বালুতে পথ হারানো। ২০০৫-এ অন্য এক আকাশ মাথার উপর ছায়া হয়ে এলো। অদ্ভুত আকাশ এক। দুই বছর ছিলো সেই ঘন কুয়াশা। তারপর আলোর মুখ দেখেছিল জাতি। এ জাতিকে বোঝা বড় দায়।

আমি যে এতো সংক্ষিপ্ত পরিসরে অতোটা বিস্তৃত ইতিহাস আলোচনা করতে পারবো না তা আপনারাও ভাল বোঝেন। কিন্তু অন্তত তুচ্ছ কিছু বিষয় হলেও আলোচনার চেষ্টা করবো বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু সেখান থেকেও হয়তো বাদ পড়তে পড়তে এই লেখা মূলত অন্তঃসারশূন্য এক চেষ্টাই মাত্র। তবুও কিছু কথায়ও যদি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারি তাহলেই সার্থকতা

www.pathagar.com

উপসংহার

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শেষ রজনীতে সপরিবারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার পথে আমাদের এই দীর্ঘ সফর শেষ হয়েছিল। তারপর আবারও আমরা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিলাম। মুজিবের মৃত্যু সেদিন একটি ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ড বলে মনে হলেও আসলে তা ছিল বাঙালি জাতির জন্য এক অপূরণীয় ও স্থায়ী ক্ষতি। বাঙালিরা কোনোদিনও এই ক্ষতির ক্ষতিপূরণ করে শেষ করতে পারবে না। আর তা সম্ভব নয়। শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর বাঙালি জাতি দিনে দিনে শুধু নিঃস্বই হয়েছে। দীর্ঘ দুই যুগ ধরে ধারাবাহিক শাসন ও শোষণ আমাদেরকে জাতি হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে একটি উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছিল। ১৯৮৫ সালে ৩৫ ডলার মাথাপিছু আয় নিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্রের লজ্জাজনক অবস্থান লাভ করেছিল। আসলে শেখ মুজিব ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন আমাদের মাঝে ঔপনিবেশিকতার ভূত তখনো লুকিয়েছিল। আর তাই তিনি দেশ ও জাতিকে সেই ভূতের হাত থেকে রক্ষা করতেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। যেখানে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একাই নেতৃত্ব দিতে চেয়েছিলেন। সেই চাওয়ার মধ্যে দোষের তো কিছু নেই। যে মানুষকে জাতি তার স্বাধীনতা আন্দোলনের এত দায়িত্ব দিতে পারলো তার হাতে দেশ গড়ার দায়িত্ব কেন আমরা দিতে পারলাম না। তিনি বাকশাল কায়েমের মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন সবাইকে এক পাটফর্মে আনতে। একাত্তরে যদি আমরা ১৬২ টির মধ্যে ১৬০ টি আসন দিতে পারি তাহলে ১৯৭৫ সালে কী সমস্যা ছিল। তাহলে কী আমাদের সেই সমর্থন ছিল যার যা স-স্বার্থ প্রণোদিত সমর্থন। কিন্তু তাওবা কী করে সম্ভব। সেই সমর্থনে তো কোনো খাদ ছিল না। আসলে ভূত ছিল কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে দেশ প্রেমিকের ভেতরে। আর তারাই বেঁকে বসলেন যখন শেখ মুজিব দেশ গড়ার স্বার্থে সামান্য একটু কঠোর হলেন। তাহলে কী আমাদের জন্য একজন মহান

www.pathagar.com

নেতার চাইতে একজন লৌহমানব দরকার। তাহলে পাকিস্তানিরা কিংবা তারও আগে ইংরেজরা কী দোষ করেছিল? আমরা যদি শাসন ও শোষণেই ভাল থাকি তাহলে এতটা মহত্ত্বের কী দরকার? ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার বাঁকে বাঁকে বাঙালি জাতির এই রহস্যময় আচরণই জাতি হিসেবে আজ বিশ্বের দরবারে সবার পেছনে আমাদের আসন নির্ধারণ করেছে। বঙ্গবন্ধু তার জ্যোতিষ্কের ঔজ্জ্বল্য ও বিরাট ব্যক্তিত্ব দিয়ে আমাদের বিশ্বের দরবারের মধ্যমণিতে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের তা আর সহ্য হলো না। তাই তো সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই আমাদের পেটে আর ঘি সহ্য হলো না। আমরা পচা গলায় ৭৫-এ মুখ ডোবানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। শেখ মুজিব ছিলো সেই নোংরামির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। তাই তো আমাদের প্রয়োজন হয়েছিল তাকে স-পরিবারে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেওয়ার। আসলে মুজিব নামেই যাদের ভীতি ছিল তারাই এটা করেছিল। করেছিল তাদের তুচ্ছ অবস্থানকে কিছুটা অর্থহীন গুরুত্ব দিয়ে সাময়িকভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে। কিন্তু তা কি কখনো সম্ভব। ইতিহাস যাকে অমরত্ব দিয়েছে ভাগ্য দেবী নিজ হাতে যাকে কাপালে বসিয়েছিল জয়ের রাজটিকা তাঁকে মুছে কার সাধ্য। তাই তো স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক ইতিহাসের বটবৃক্ষ মহান মহীয়ান বিশ্বের দরবারে বাঙালি জাতির একমাত্র পরিচয় মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরই মূলত স্বাধীনতার ইতিহাসে দীর্ঘ শিকড়ের মাথায় জন্মানো সোনালি বৃক্ষ। তিনি সেই দীর্ঘ আর কাঙ্ক্ষিত পথের লক্ষ্য। তিনি মূলত গন্তব্য। স্বাধীনতার এই দীর্ঘ পথ জুড়ে তার জীবন দেখলেই আমরা বুঝতে পারি স্বাধীনতা এক দিনে আসেনি।

www.pathagar.com

The Pakistani Instrument of Surrender

The Pakistani Instrument of Surrender was a written agreement that enabled the surrender of Pakistan Armed Forces in the Bangladesh Liberation War. The surrender took place on 16 December 1971 at the Ramna Race Course in Dhaka.

Lieutenant-General A A K Niazi, Martial Law Administrator of West Pakistan, surrendered to Lieutenant General Jagjit Singh Aurora, Joint Commander of the Bangladesh-India Allied Forces. Air Commodore A. K. Khandker acted as witness on behalf of the Bangladesh Armed Forces. Thousands of people celebrated the ceremony in central Dhaka, marking the liberation of Bangladesh and the victory of the independence war that began on 25 March 1971.

Subsequently, around 93,000 Pakistani troops and officials were taken as prisoners-of-war by the Indian Army, the largest number of POWs since World War II. They were later repatriated in 1973 under the terms of the Delhi Agreement.

www.pathagar.com

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrenders. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant General
General Officer Commanding in Chief
India and BANGLA DESH Forces in the
Eastern Theatre

16 December 1971.

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (Pakistan)

16 December 1971

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

১. *বাংলাদেশ—রাজনীতির চার দশক*—সম্পাদনা তারেক শামসুর রেহমান।

২. *কিশোর মুক্তিযুদ্ধ কোষ*—সম্পাদনা মুনতাসীর মামুন।

৩. *ইতিহাসের মহানায়ক—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর*-জয়শ্রী জামান।

৪. *একটি গণহত্যার অপ্রকাশিত দলিল*-হিমু অধিকারী

৫. *আওয়ামী লীগের ইতিহাস-(১৯৪৯-১৯৭১)* —আবু আল সাঈদ

৬. *The Awami League (১৯৪৯-১৯৭১)*-Shyamali Ghosh

৭. *মহাকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী*—বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মোঃ আশরাফুল ইসলাম খান এবং মোঃ লুৎফর রহমান

৮. *৮. স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু*-সম্পাদনা প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুব-উল-ইসলাম এবং সাইফুল্লাহ আল-মামুন

৯. *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*-মুক্তিযুদ্ধ—১৯৭১—রফিকুল ইসলাম

১০. *বাংলাদেশ-রক্তাক্ত অধ্যায় (১৯৭৫-৮১)* —বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন এনডিসি, পিএসসি (অব.)।

১১. *বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, লক্ষ্য ও সংগ্রাম*—নুরুল ইসলাম নাহিদ

১২. *একাত্তরের ডায়েরি*—সুলতানা কামাল।

১৩. *তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা*—লে. কর্ণেল (অব.) এম এ হামিদ পিএসসি।

১৪. *একাত্তরের ২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা*-মোহাম্মদ শাহজাহান।

১৫. *জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*—সম্পাদনা ড. শাহাদাত হোসেন।

www.pathagar.com

১৬. *মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিব বাহিনী*—অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী।
১৭. *Sheikh Mujib's Nine Months In Pakistan Prison*—Blood Beaten Track–Ahmed Salim
১৮. *সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা—বাংলাদেশের সচিত্র ইতিহাস* (১২০৪-১৯৭১)
১৯. *দ্য রেইপ অব বাংলাদেশ*—অ্যান্থনী মাসকারেনহাস।
২০. *বাংলাদেশ-রক্তের ঋণ*—অ্যান্থনী মাসকারেনহাস।
২১. *দি ইস্ট পাকিস্তান ট্রাজেডি*—এল. রাশব্রুক উইলিয়ামস।
২২. *হক-ভাসানী- সোহরাওয়ার্দী-মুজিব*—রামেন্দ্র চৌধুরী।
২৩. *রক্তের বদলে*—মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম।
২৪. *১৫ আগস্ট মর্মন্তুদ মৃত্যুচিন্তা*—সম্পাদনা আহম্মেদ ফিরোজ।
২৫. *বাংলাদেশ-জয় পরাজয়ের রাজনীতি (১৯৫৪-১৯৮৩)*—সরদার আমজাদ হোসেন।
২৬. *বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা*—এডভোকেট চিত্ত রঞ্জন দত্ত
২৭. *মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১*—মুনতাসীর মামুন।
২৮. *বাংলার বিদ্রোহ (১৯৪৭- ১৯৭১)*—হোসেনউদ্দীন হোসেন
২৯. *চল্লিশ থেকে একাত্তর*—এম আর আখতার মুকুল।
৩০. *দাঙ্গার ইতিহাস*—শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩১. *A Global History of The Creation of Bangladesh*– Srinath Raghavan.
৩২. *Myth facts-Bangladesh Liberation War*—How India, US, China *and the USSR Shaped the outcome*–B Z Khasru.
৩৩. *মুজিবুরের রচনা সংগ্রহ*—শেখ মুজিবুর রহমান।
৩৪. *Divide and Quite*–Penderel Moon.
৩৫. *Surrender at Dacca–Birth of a Nation*–Lt. Gen. JFR Jacob.
৩৬. *Witness to Surrender*–Siddik Salik.
৩৭. *Towards India's Freedom and Partition*—S. R. Meherotra.
৩৮. *Since 1947-Partition Narratives by the Migrants of Delhi*– Ravinder Kaur.
৩৯. *বাংলাদেশের তারিখ*—মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

www.pathagar.com

৪০. *ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের আসল চেহারা*—মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন।

৪১. *বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম*—শেখ হাসিনা।

৪২. *On History* – Eric Hobsbawm.

৪৩. *Ancient Indian History and Civil Ligatia* – S N Sen.

৪৪. *শত মনীষীর জীবনী*—ড. হুমায়ুন কবীর।

৪৫. *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান—জীবন ও রাজনীতি-(১ম ও ২য় খণ্ড)* সম্পাদক–মোনায়েম সরকার

৪৬. *বাঙলা ভাগ হলো—হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ (১৯৩২-১৯৪৭)*-জয়া চ্যাটার্জী

৪৭. *গৌরবের ৫৫ বছর-বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।*

৪৮. *ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)* —গোপাল চন্দ্র সিনহা।

৪৯. *আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস*—ড. সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও ড. সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

৫০. *বাঙালির অপর নাম শেখ মুজিবুর রহমান*—সম্পাদনা রোকন জহুর।

৫১. *রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার দর্শন*—বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ।

৫২. *বাংলাদেশের ইতিহাস*—প্রাচীন যুগ-রমেশ চন্দ্র রায়।

৫৩. *স্বাধীনতা অর্জনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-(১৮৮৫-১৯৪৭)*–অমলেশ ত্রিপাঠী।

৫৪. *ভারত স্বাধীন হলো*—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

৫৫. *শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক*—সিরাজ উদ্দিন আহ্মেদ।

৫৬. *উপমহাদেশের রাজনীতি ও ব্যক্তিত্ব* —অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম।

৫৭. *Freedom at Midnight*—Lary Collins And Dominique Lapierre.

৫৮. *গাজীপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*—বিলু কবীর।

৫৯. *জিন্নাহ ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা*—যশোবন্ত সিংহ।

৬০. *হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী*—সিরাজ উদ্দীন আহম্মেদ।

৬১. *Assasination of Ziaur Rahman and Aftermath*—Ziauddin M. Chowdhury.

www.pathagar.com

৬২. *Bangladesh Nationalisam—History of Dialectics and Dimensions* —Shireen Hasan Osmany.

৬৩. *Anmol Dictionary of History*—Satish Ganjoo.

৬৪. *আমার রাজনীতির রূপরেখা*—জিয়াউর রহমান।

৬৫. *বাঙালির ইতিহাস (আদি পর্ব)*-নীহাররঞ্জন রায়।

৬৬. *ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ*-সরল চট্টোপাধ্যায়।

৬৭. *History of the Faraidi Movement*—Dr. Muin-ud-Din Ahmed Khan.

৬৮. *বাংলার ইতিহাস*—গোলাম হোসায়ন সলীম।

৬৯. *বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি*—সুনীতি কুমার ঘোষ।

৭০. *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*—মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক।

৭১. *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি*—তারাপদ লাহিড়ী।

৭২. *জিন্না/পাকিস্তান-নতুন ভাষা*—শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭৩. *মৌলানা আবুল কালাম আজাদ*-(জাতীয়তাবাদের সন্ধানে)—শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭৪. *স্বাধীনতার মুখ*—অমলেশ ত্রিপাঠী।

৭৫. *The Myth of Indepedence*–Zulfikar Ali Bhutto.

৭৬. *Jinnah–Creator of Pakistan*–Hector Bolitho.

৭৭. *M A Jinnah-Views and Reviews*—M. R. Kazimi.

৭৮. *The Bangladesh Military Coup and the CIA Link*– B Z Khasru.

৭৯. *The Blood Telegram*–Indians Secret War in East Pakistan–Gary J. Bass.

৮০. *মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস-বাঙালীর ইতিহাস*—এস এম আজিজুল হক শাহজাহান।

৮১. *Pakistan Studies*—M R Kazimi.

৮২. *Jinnah, Pakistan and Islamic Identity*–The Search for Saladin–M R Kazimi.

www.pathagar.com

৮৩. *The Last days of United Pakistan*–G M Choudhury.

৮৪. *এ স্ট্রেন্‌জার ইন মাই ওউন কান্ট্রি-ইস্ট পাকিস্তান (১৯৬৯-১৯৭১)।*

৮৫. *The Seperation of East Pakistan—The Rise of Bangali Muslim Nationalism*–Hasan Zaheer.

৮৬. *আমার একাত্তর*—আনিসুজ্জামান

৮৭. *Bangabandhu Sheikh Mujib*–A Leader with a Difference-Obaidul Haq.

৮৮. *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং তাতে কি ছিল*—আব্দুল মতিন।

৮৯. *Nationalisn, Fundamentalism and Democracy in Bangladesh* -B K Jahangir.

৯০. *ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*—বদরুদ্দীন ওমর।

৯১. *Spotlight on Bangladesh*–Edited by G S Pohekar

৯২. *অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা*—মেজর (অব.) এম এ জলিল।

৯৩. *Bangladesh from Mujib to Ershad—An Interpretive Study*–Lawrence Ziring.

৯৪. *একাত্তরের দিনগুলি*—জাহানারা ইমাম।

৯৫. *Politics and Security of Bangladesh*–Talukdar Maniruzzaman.

৯৬. *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব—বাঙালি জাতীয়তাবাদ*—কবীর চৌধুরী।

৯৭. *ভারতে সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতার ইতিবৃত্ত*—ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯৮. *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*—আবুল মনসুর আহমেদ।

৯৯. *দুঃশাসনে বন্দি স্বদেশ*—মারুফ কালাম খান।

১০০. *ভারতবর্ষের ইতিহাস*—রোমিলা থাপার।

১০১. *বাঙলার ইতিহাস*—চার্লস স্টুয়ার্ট—অনুবাদ-আবু জাফর।

১০২. *নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া*—সৈয়দ আবদাল আহমেদ।

১০৩. *Begum Khaleda Zia of Bangladesh*—S Abdul Hakim.

১০৪. *বাংলাদেশ জেনোসাইড এন্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস*—ফজলুল কাদের কাদেরী।

১০৫. *Bangladesh Emergercy and the Aftermath–2007-2008*–Moudud Ahmed.

www.pathagar.com

১০৬. *Sheikh Mujib –Triumph and Tragedy*–S A Karim.

১০৭. *দ্য বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান*–লে. জে. এ এ কে নিয়াজি।

১০৮. *Bangladesh and Pakistan–Flirting with Failures in South Asia*–William B Milam.

১০৯. *The Cruel Birth of Bangladesh*–Memories of an American Diplomat–Archer K Blood.

www.pathagar.com

ওমর খালেদ রুমি
জন্ম : ১০ জানুয়ারি ১৯৭৫
পিতা : মোহাম্মদ আইউব আলী হাওলাদার
মাতা : রহিমা খাতুন
জন্মস্থান : পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর উপজেলা,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর
পরবর্তীতে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাইন্যান্সে এমবিএ। এলএল.বি করেছেন সেন্ট্রাল ল' কলেজ থেকে।

প্রথম গ্রন্থ 'আশায় তুমি নিরাশায়ও তুমি'
(উপন্যাস, ২০০১)
তারপর একে একে অনেক গ্রন্থ বেরিয়েছে।

সহধর্মিণী শামিমা আক্তার।

প্রচ্ছদ : মোবারক হোসেন লিটন

www.pathagar.com

ISBN 978-984-91701-6-7